ঝরাপাতা

শিশিরকুমার মাইতি

আশাবরী পাবলিকেশন
২৪ ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন
সাঁত্রাগাছি / হাওড়া

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ, ১৩৭২

প্রকাশক

প্রভা মাইতি বি. এ. বি. টি
আশাবরী পাবলিকেশন
২৪ ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন
সাঁত্রাগাছি, হাওড়া

প্রচ্ছদপট
শ্যামল মিত্র

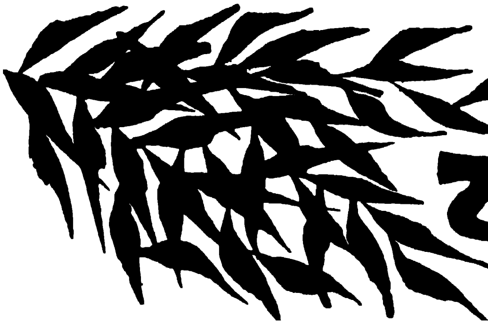
অলংকরণ
নরেন রায় (সুফি)
পূরবী দাস

সহায়তা করেছেন
সুধীরকুমার দে
মনোজিৎ রায়

মুদ্রাকর
মদনমোহন কোলে
১০/২ নেপাল সাহা লেন
রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া

ব্লক করেছেন
চিত্রদীপ ষ্টুডিও

কবি গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু



ঝরা পাতা

শরতের শেষ তখনো হয়নি। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে আকাশ রঞ্জিত। মাঝে মাঝে বৌ-তাড়ানো বৃষ্টি, কনে-দেখা আলো আর রামধনুর সপ্ত রং দক্ষ শিল্পীর মনে জাগায় শিহরণ, হৃদয়ে তোলে আলোড়ন। নানান ফুলের মধুর গন্ধে বাতাস সুবাসিত। দূর থেকে শূন্যে ভেসে আসে কোন্ এক বিরহীর বেদনার করুণ গানের কলি :

জীবন-নদী খাদের মাঝে পড়ে
খানিক জল অশ্রুধারায় ঝরে
ওরে, মোহের বশে পুতুলি মোর
আপন নাশের স্বপনে বিভোর ॥

উদাস দৃষ্টি মেলে জানালার ধারে শুয়েছিল মুক্তিবাবু। নানান এলোমেলো চিন্তার ঝড়ে মন তার বিধ্বস্ত। ক'টা দিন নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করছে এই অন্ধকার নির্জন কারাগারে। পাশে তার কেউ নেই। সংসারের জঞ্জাল হয়ে পড়েছে এই বয়সে। ক'দিন প্রেসারের চাপ অত্যধিক বেড়ে গেছে। কখন এই ধূলিমাখা পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যাবে তার স্থিরতা নেই। তবু যাবার আগে কার কাছে যেন কি দেবার ছিল সেজন্যে প্রতীক্ষা করে বসে আছে। বৈঠকে আমুদে মানুষের প্রাণের সঙ্গী আজ সরে গেছে দূরে, বহু দূরে। সংসারে মানুষটা সব কিছু দিয়ে গেল, পেল না কিছু। তবু যাকে দেবার অনেক কিছু ছিল দেওয়া হল না কিছুই,

পাওয়ার ছিল যার অনেক, পেল না কিছুই, যার উজ্জ্বল প্রতিভার বিকাশের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে সমাজের বুকে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে বলে স্থির করেছিল, যার কোমল-তরুণ মনকে নিয়ে কিছুটা ছিনিমিনি খেলেছে, কিছুটা নিজের আদর্শের পথে পরিচালিত করতে চেয়েছে, বেশ কিছুটা কাছে পেতে চেয়েছে—বিসদৃশ পরিবেশ আর বাঁধভাঙা বিবোধিতা, কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির খেসারতে আজ নিজের নির্বাসনের মতই মনের মানুষও নির্বাসিত হয়েছে। আজ তার কাছ থেকে শেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিতে চায়।

উদাসী সূর্য অস্ত যায়। আঁধার নামতে থাকে। বকেরা ফেরে। গাভীদের ত্রস্ত পদ। রাখালদের ক্লান্ত অবয়ব। বিজন পথ। খুরের শব্দ। মেঠো পথের ঝড়ো ধুলো। তপ্তদিনের অগ্নি-জ্বালা থেকে রেহাই পায় নি কেউ। তাই নিষ্প্রাণ গাছগুলো নিষ্করুণ সূর্যদেবকে যেন ভ্রূকুটি করে। তবুও শরতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় নিজেদের শাখাপ্রশাখাগুলোকে ছড়িয়ে দেয়। গাছগুলোর মাথা নড়ে। প্রকৃতি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। শিশুরা খেলতে শুরু করে। অফিসের কলম-পেশা ক্লান্ত মুখ মানুষগুলি শ্রান্ত দেহে ঘরে ফেরে। ত্রস্ত ভাব। চতুর্দিকে নিষ্প্রাণতা, ক্লান্তির স্পন্দন। শুধু মুক্তিবাবুর এই ঘরটা যেন কংসের কারাগার। একটা মানুষ ক'দিন একই বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কস্‌ছে তার খবর কেউ রাখছে না। এই অসার প্রাণহীন সংসারের বাকী তিনটে প্রাণীর উপরেও তার সামান্য সহানুভূতি নেই। ওরা অভিনয় করছে। প্রতারিত করছে—এই ভাব। মনে শান্তি পাচ্ছে না। অবচেতন মনে আর্তনাদ: ডাক্তার, ওর কি ক্ষতি করলাম তা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না। পারছি না। আমাকে তুমি মেরে ফেলো। আমাকে···আ···মা···কে তুমি মুক্তি দাও। মুক্তি দাও।

—'এত উত্তেজিত হলে শরীরের ক্ষতি হবে মুক্তিবাবু। আপনি অযথা উত্তেজিত হবেন না। আমার যত ভাল ওষুধ আছে আমি সব এনেছি। আপনার চিন্তা নেই। ক'দিনের মধ্যেই সেরে উঠবেন। এত দুশ্চিন্তা করছেন কেন? রক্তের চাপটা

খুব বেশি আছে, ক্ষতি হতে পারে। আমি সারিয়ে তুলবোই আপনাকে।

—'ও সব ওষুধে কিছু হবে না ডাক্তার, কিছুই হবে না, ওষুধ আর খাবো না। মরতে হয় তিলে তিলে মরবো। অনুশোচনা করবো। একটা প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটিয়েছি, তার শাস্তি ভোগ করবো না?

—'অতীত ভুলে যান, মুক্তিবাবু। কত মানুষের সঙ্গে সংসারে আলাপ হয়, ক'জনের কথা আপনার মনে আছে? সব বিস্মৃতি! সকলকে ভুলতে হয়। সংসার মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। সকলকে ভুলে যেতে হয়, নইলে ক্ষতি হয়। মৃত্যুতেই মানুষের পরম শান্তি। বিদায়ক্ষণে আপনার আর কাউকে কিছু বলার নেই। স্ত্রীপুত্রপরিবার—সকলকে ভুলে গেছেন, তাকেও ভুলে যান, ভাল হবে।'

—(উত্তেজিত হয়ে) 'ভুলতে পারি না ডাক্তার, পারি না। ও ভোলা যায় না। ও...আপনি বুঝবেন না। ক'টা সুন্দর মনের মানুষ দেখেছেন? সুন্দর চেহারা দেখলেই তো কাটাকুটি করেন! ওতেই আপনাদের সুখ, আনন্দ। আমি যদি তাকে দেখাতে পারতাম! সমাজের আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে তার কত তফাৎ তা বুঝতে পারতেন। বোঝাতে পারতাম!'

সৌমেন্দু আসে। নির্জন নিষ্প্রদীপ কারাগারে অকস্মাৎ শত দীপ জ্বলে ওঠে। মুক্তিবাবু এতদিন পরে যেন মুক্তি পেলেন। চোখে মুখে তাঁর আনন্দের ছায়া ফুটে উঠল। সমস্ত অসুখ যেন মুহূর্তে সেরে গেল। সৌমেন্দুর হাত দুটো ভীষণ শক্ত করে ধরে তাকে বিছানার একপাশে বসাল। অব্যক্ত একটা ব্যথা, বহুদিনের না-বলা একটা কাহিনী তাঁর মনের মধ্যে এসে ভীড় করতে লাগল। কিন্তু কি দিয়ে শুরু করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। সৌমেন্দুর হাতে-মুখে-গায়ে তাঁর জীর্ণহাত বোলাতে লাগলেন। সৌমেন্দুর মুখের দিকে করুণ চোখে চেয়ে থাকলেন এক দৃষ্টিতে। চোখের পলক যেন পড়ে না। সৌমেন্দু পথ শ্রমে ক্লান্ত। মানসিক উদ্বিগ্ন। তার মুখেও কথা নেই। মুখটা

নীচু করে বসে থাকে। মুক্তিবাবুর চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। সৌমেন্দুর হাতের ওপর টপ টপ করে ঝরে পড়ে সেই জল। মনের মধ্যে বিদ্রোহীরা এতক্ষণ পরে যেন সবাক হয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে। সৌমেন্দু নিজেকে সংযত করে বলে,-'চিন্তার কিছু নেই কাকাবাবু, ওসব সেরে যাবে। আপনাকে আজ অনেকটা সুস্থ দেখছি। প্রেসার কত আছে?'

অপেক্ষমান ডাক্তারবাবু ব্যাপারটা কিছুটা অনুমান করে। ডাক্তার নিজে থেকেই বলে: 'যা প্রেসার আছে তাতে উত্তেজনা ভাল নয়। উনি যাতে উত্তেজিত না হন সেদিকে একটু নজর দেবেন। শরীরের ক্ষতি হতে পারে। আমি খুব ভাল ওষুধ দিচ্ছি ওসব সেরে যাবে। অযথা চিন্তা করবেন না।'

কথা কেড়ে নিয়ে মুক্তিবাবু বলেন—ছাই সারবে? আমার বাঁদরগুলোর জন্যেই তো আজ আমার এই দশা, ডাক্তার। কি তোমায় বলবো! আর কি তোমায় বোঝাবো, আমার স্ত্রীকে আজও বুঝতে পারলুম না। আমার সুখের স্বপ্ন—কত দিন ধরে সৌমেন্দুকে নিয়ে সাধনা করলাম আজ তা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। বস্তিবাড়ির একটা রকবাজ বখাটে ছোঁড়াকে পছন্দ হল? ছ্যা! ছ্যা! ছ্যা! মর, অধঃপতনে যা। সংসার করেই ভুল করেছি। সৌমেন্দুর হাতটা আরও শক্ত করে ধরে বলেন: বাবা, আমাকে ভুল বুঝো না, তোমার প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটিয়েছি। তোমাকে নষ্ট করে দিয়েছি, তোমার অনেক ক্ষতি করেছি। তোমার উন্নতির পথে আমিই কণ্টক ছিলাম। আমায় ক্ষমা করো; বলো, ক্ষমা করবে তো?

রুগীর তীব্র উত্তেজনার ভাব দেখে ডাক্তার ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু মুক্তিবাবু ভ্রূক্ষেপ করেন না। বলেন: জানো সৌমেন্দু, আর হয়ত বাঁচবো না, তবু তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া বাকী ছিল, আজ সেই কর্তব্যটুকু সেরে ফিরতে পারলেই বাঁচি। তুমি ঠিক সময়ে এসেছ বাবা। আর হয়ত বাঁচবো না। এই মুহূর্তে তোমাকেই আমার প্রয়োজন। দেখছ না আমার বিছানার ধারে কাছে কেউই নেই।

সকলেই বিরক্ত আমি সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কাউকে দরকার নেই। আমি···বাড়ির······কর্তা, আর আমিই জঞ্জাল, না? সবাইকে তাড়িয়ে দেবো। না···না···না আর পারি না। আর পারি না। তুমি এসেছ, আসবে জানতাম। তোমার কর্তব্যজ্ঞান আছে। তোমার সে শিক্ষা আছে। কি আমি তোমার করতে পারলাম! তোমার তো শুধু সর্বনাশই করলাম। তুমি আমায় ক্ষমা করবে না?'

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সৌমেন্দু তাঁর চোখের জল নিজের রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বলে—'কাকাবাবু, একি করছেন? প্রেসারে উত্তেজনা মোটেই ভাল নয়। ক'দিন আপনার জন্যে ঘুমাতে পারি নি; কাজ করতে পারছি না। কিন্তু আসতেও বাধা। তাই······ একান্তে দুঃখ করে মনের তৃপ্তি পাই।'

উত্তেজিত হয়ে মুক্তিবাবু বলেন: 'বাড়িটা কার—আমার না ঐ বাঁদরদের? আমার পয়সায় ওরা খাচ্ছে, সিনেমা দেখছে, নবাবী করছে, আর আমাকে কুকুর-বেড়ালের মতো করে ফেলে রেখেছে। বাবা, এমন নরক ভোগ তুমি দেখেছ কখনও সৌম্য? মেয়ে জাতটা এতখানি অকৃতজ্ঞ এ আমি জানতাম না। ওদের সামান্য মমত্ববোধ টুকুও নেই। বাবাকে এতখানি অবজ্ঞা? তোমরাও তো বাবা ছিল, তাঁকে এইভাবে মৃত্যুর সময়ে একা পড়ে থাকতে তুমি দেখেছ? আর পারি না সৌম্য, আর···পারি না···। ব্যাঙ্কে যা টাকা আছে······সিন্দুকে যা আছে······(হঠাৎ দারুণ কাশির ঝোঁকে চোখ-মুখ বিকৃত হতে লাগল।) সৌমেন্দু উঠে ভেতর থেকে জল এনে চোখে-মুখে দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। ডাক্তার মরফিয়া দিয়ে অচৈতন্য করে রাখে। সৌমেন্দু ডাক্তারের ব্যাগটা নিয়ে পথে আসে। ডাক্তার এই সৌম্যকান্তি সুপুরুষ ছেলেটাকে দেখে ভীষণ কৌতূহল বোধ করে। বলে: সৌমেন্দুবাবু, আর একটু আসবেন। ভাল হয় এলে। আমার চেম্বারটা খুব কাছেই। চলুন, চলুন।

সৌমেন্দু দ্বিধাবোধ করে: কিন্তু·········।

বুঝতে পেরে ডাক্তার বলে—না, না এখন মরফিয়ার ঘোর কাটতে কয়েক ঘণ্টা কেটে যাবে। এর মধ্যে এখুনিই ফিরে পড়বো। একটা ওষুধ আবিষ্কার করবো। এজন্যে আপনাকে বিশেষ প্রয়োজন আছে। আরে চলুন চলুন, যেতে মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। কি হল, আবার থামছেন? বললাম তো ওনার জন্যে দুশ্চিন্তার কি আছে? আমি তো ওনাকে অনেক বছর ধরে দেখছি। ওনার সব কথা জানি। তাহলে চিন্তা কি আছে? ও সব সেরে যাবে। আপনার কাকাবাবু সেরে উঠবেন খুব তাড়াতাড়ি। চলুন, চলুন, কাছেই আমার ডিস্‌পেনসারী।

[২]

টিপটিপ বৃষ্টির শুরু। ঝড়ো বাতাস আনন্দে নৃত্য করে। বাহারে গাছগুলোর ওপরে যেন শান্তিজলের ঝাপটা পড়ে। তারা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শুকনো মাটিতে ধুলোর বিছানা ভিজে যায়। ফুলের গায়ে মূর্ছা লাগে। আকাশ পরিষ্কার হয়। মাঝে মাঝে তার গায়ে দেখা যায় কলঙ্কের কালো মেঘ। তারা দল বেঁধে দম্ভে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। দুর্বল ব্যূহ পেলে আক্রমণ শুরু করে। সৈন্যদল তীর মেরে মেঘের আস্তরণ ফুটো করে দেয়। বৃষ্টি ঝরতে থাকে। কখনও মিহিদানা, কখনও মোটাদানা। কখনও মিশ্রণ। খেয়ালী মেঘ। উদাসী ভাবনা। সিগারেটটা কতক্ষণ আগে ধরিয়েছে তা ডাক্তার ভুলে যায়। হঠাৎ আগুন হাতে লাগে: আরে আপনি এতক্ষণ বসে আছেন? কি ভাবছেন? মুক্তিবাবু ······মানুষটা······সত্যিই কি অদ্ভুত! দেখুন, একেবারে আটপৌরে বৈঠকে মানুষ তার ভাগ্যে এমন হতে পারে এ আমি ভাবতে পারি নি। আপনি তো এত পড়াশুনা করেছেন, এরকম ভাগ্যের মানুষ ক'টা দেখেছেন? বেশি বোধ হয় না। সত্যাই নিজের চেয়ে পর ভাল। আত্মীয়ের চেয়ে অনাত্মীয়রা অনেক সময় মানুষের অনেক বেশি উপকার করে। আপনি ওনার জীবনে অনেক খানি অংশ জুড়ে আছেন। জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আপনি মানুষটার সঙ্গে এক সময় নিশ্চয়ই ভীষণভাবে মিশে

গিয়েছিলেন। তারপর সংসারের ঝড়ঝাপটায় বিধ্বস্ত হয়ে সরে গেছেন। এজন্যে ভদ্রলোকের এতখানি ক্ষোভ দেখলাম। সত্যই সৌমেন্দুবাবু, আমি এতদিন ডাক্তারি করলাম, কত রোগ, রোগী ঘাঁটাঘাটি করলাম, কিন্তু মনের রাজত্বে আজও প্রবেশ করতে পারলাম না। অথচ ডাক্তারী বিদ্যায় মন না জানলে ভাল চিকিৎসা করা যায় না। আমি এ জন্যে রোগীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গভীরভাবে কথা বলি; কারণ ডাক্তারী বিদ্যা কি জানেন, রোগের বাঁধাধরা কিছু লক্ষণ থাকে, সেই লক্ষণগুলো ভাল করে লক্ষ্য রেখে ওষুধ দেওয়া। লক্ষণ না ধরতে পারলে তো চিকিৎসাই করা যাবে না। তাই না?

বাইরে সুন্দরী সাজে সজ্জিতা প্রকৃতিরানী বিচিত্র পোষাকে অভিসারে প্রতীক্ষারত। বিমোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকে সৌমেন্দু। আবেগভরা এত কথা হল তার কর্ণকুহরে বোধ করি যায় নি। ডাক্তার হঠাৎ চেয়ে দেখে বিস্ময়বোধ করে। ভাবে: এজন্যেই এত রকম ওষুধ দিলাম কোনোটাতেই কাজ হবার নাম নেই। মনের রোগ সারাবার ওষুধ কি ডাক্তারী শাস্ত্রে সব সময় পাওয়া যায়? মনের সঙ্গে যার গভীর মিল অসুখের সময়ে তাকে কাছে রাখা প্রয়োজন। মুক্তিবাবুকে এবার হয়ত বাঁচানো যাবে।

"আমি চলি ডাক্তার"—সৌমেন্দু উঠে পড়ে।

কোথায়?

বাড়ি।

চলুন, আমিও যাবো। কিন্তু আপনি তন্ময় দৃষ্টিতে সুন্দর প্রকৃতির দিকে চেয়ে আছেন সেজন্যে আপনাকে disturb করি নি। আপনার লেখার চর্চা আছে না?

না তো! সৌমেন্দু লজ্জা কাটাতে ব্যস্ত হয়।

আমরা ডাক্তারি করি বলে সাহিত্য করতে পারি না। বই-টই আছে আপনার নিশ্চয়ই। আমি কিন্তু··নাড়ী, রোগ আর রোগী নিয়ে আমার পেশা, কিন্তু সাহিত্য আমার নেশা। জানেন বিয়ে থা এখনও করি নি। অবসর সময়ে পড়ি সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ,

বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের সব বই এখানেই পাবেন। জীবনানন্দ দাশ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, বিষ্ণু দে-এই সব আধুনিক কবিদের কবিতার বইও আছে। পাবেন ফ্রয়েড, জেনেট, হার্ট, টমসন-এই সব মনোবিজ্ঞানীদের বই, আবার মিল, রুশো, প্লেটোর বইও বাদ নেই। কি করি বলুন। বইয়ের মতো সৎ বন্ধু একটাও নেই সৌমেন্দুবাবু। আপনার পোষাক আর উদাসী মন দেখলে perfect সাহিত্যিক বলে মনে হয়।

মনে অনেক জিনিসই তো হয় বাস্তবে তা হয় না। দেবা ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যাঃ। মানুষতো কোন ছার! আপনি মেয়েদের মন বোঝেন ?

হঠাৎ ললনা ? সৌমেন্দুবাবু! কি ব্যাপার বলুনতো! ডাক্তারের কণ্ঠে বিস্ময়।

না মানে, দিগ্‌অঙ্গনার কথা বলেছিলাম! মেঘের সিঁদুরে রঙ চারদিকে মধুর গন্ধ মনে হয় কোনো যুবতী বিচিত্র সাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কা······র প্রতীক্ষায় রত।

বাবা এতো পাকা কবিত্বের পরিচয়! আচ্ছা সৌমেন্দুবাবু, মুক্তিবাবুর সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয় ? দেখলাম ভদ্রলোক আপনাকে খুব ভালবাসেন। তাই না ?

একটু গম্ভীর হয়ে সৌমেন্দু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে—সে অনেক কথা, অনেক কাহিনী, কত বলবো বলুন ?

কি জানেন, সামান্য জা ...না....লে কিন্তু আমার খুব ভাল হতো। আমার মানে, আপনার মনের মানুষ মুক্তিবাবুর চিকিৎসা করতে সুবিধা হতো। জানেন, কত variety ওষুধ দিচ্ছি কিছু-তেই সারাতে পারছি না। অথচ আপনি তো ওনাদের পারিবারিক অবস্থা জানেন, ওনার ওপরে একটা বড় সংসার নির্ভর করছে।

এক সময় জানতাম। তারপর........তারপর........ না.... ...

ডাক্তার কি ভাবছিল হঠাৎ : না, না, সৌমেন্দুবাবু, এভাবে চেপে গেলে রোগীর চিকিৎসার ক্ষতি হবে। একটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। একটা পরিবার নষ্ট হবে। আর আপনি নিরপেক্ষ থাকবেন ? সামাজিক অপরাধ হবে না ?

সৌমেন্দু কিছুটা বিমর্ষ হয়ে বলে : ডাক্তার. এভাবে আমার সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে ওদের সঙ্গে পূর্বের relation-টা জানতে চান ? আর সামান্য ক'টা কথার জন্যে যদি একটা পরিবার বাঁচে, মুক্তিবাবুর যদি মঙ্গল হয় আপনি যা প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করুন আমি সব প্রশ্নের উত্তর আজ দেবো। সৌমেন্দু আবার বসে।

না, না. সৌমেন্দু ভাই, আপনার কোনো ক্ষতি করতে আমি চাই না। আপত্তি থাকলে বলবেন কেন ? আর যে অংশ আপত্তিকর বলে মনে করবেন সে অংশ বাদ দিয়েই বলুন। সৌমেন্দু শুরু করে—শুনুন তাহলে—এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে মুক্তিবাবুর প্রথম আলাপ। সে বছর-চারেক আগের কথা। সে আসরে ভক্তিমূলক গান বেশ কয়েকটা গেয়েছিলাম। প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে। শ্রোতারা সত্যিই ভীষণ সন্তুষ্ট হয়েছিল। আমার গলার জন্যে সেই প্রথম আমি পুরস্কৃত হই। মুক্তিবাবু ভীষণ গান ভালবাসেন। মূলতঃ ভক্তিগীতি। সেই আসরেই আমার নাম আর ঠিকানা নিয়ে হাজির হন এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বর্ষণমুখর দিনে। সেই প্রথম বাড়িতে এলেন ; সঙ্গে ছিলেন আমার পূর্ব পরিচিত স্থানীয় সুখ্যাত স্কুলের একজন শিক্ষক। রাজনীতির কথা হল। গানের কথা হল। আমার পরিবারের অন্যান্য মানুষের সম্পর্কেও কথা হল। উনি আমাদের সমবর্ণের ছিলেন। নিজ বর্ণের প্রতি মোহ তাঁর ছিল জাগ্রত। অনেক দূরে নির্জন মরুতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠিত ছেলেকে পেয়ে সেদিন থেকেই তার আকর্ষণের মাত্রার ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করেছি। আমি যেখানে যেতাম উনিও সেখানে যেতেন। আমার গান আর বক্তৃতার উপরে দেখতাম ওঁর আগ্রহের মাত্রা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। আমিও যেন ওনাকে পেলে কি একটা অদৃশ্য শক্তি অনুভব করতাম। কত পুরস্কার পেয়েছি, সর্বাগ্রে এনে ওনাকে দিতাম। ওনার বাড়িতে আমাকে নিয়ে আলোচনা হতো। কত দিন ওনার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে কত অনুরোধ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তারপর·········তারপর·········আর জানবেন ?

হুঁ। ডাক্তার আবার সিগারেট ধরিয়ে বলে—এ বেশ, কোনো একটা রোমান্টিক গল্পের প্রথমটা বলে মনে হয়। তারপর ·· আপনি যাবেন। এই তো। কিন্তু সৌমেন্দুবাবু চুপ করলেন কেন ? বলুন।

সৌমেন্দু আরম্ভ করে 'ও, না, হ্যাঁ যা বলছিলাম, তারপব একদিন গেলাম। সোনালী স্বপ্নে গড়া সে দিন, আমি যাবো ·········কোথায় যাচ্ছি ········এ কিন্তু ভাবিনি। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে যেতে তিনি এতখানি উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়বেন এ আমি ভাবতে পারি নি। আমাকে দেখতে পেয়ে একেবারে গভীর স্নেহ করে আমার হাতটা ধরে ওনার চেম্বারে নিয়ে গেলেন। আমি ভীষণ লাজুক, আপান জানেন। মাথাটা নীচু করে বসে থাকলাম। মুক্তিবাবুর সঙ্গে কত বিচিত্র গল্প হল। হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা এলেন। মুক্তিবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, ও-তুমিই সৌমেন্দু—তার প্রথম জিজ্ঞাসা।

আমি মাথা নীচু করে উত্তর দিলাম—হ্যাঁ।

তিনি বললেন, বাবা লজ্জাবতী লতা যে। তোমরা তো পুরুষ, সব সময় মাথা তুলে রাখবে। তোলো দেখি মুখটা।

মুখটা তুলে একবার তাকিয়ে নিলাম। সাজ-পোষাকে বেশ কিছুটা আভিজাত্যের ছাপ আছে। কিন্তু কথাবার্তা বেশ স্পষ্ট। কিছুটা ঝাঁঝালো ভাব। মেকি আভিজাত্যের সুর গলায় রয়েছে। পর পর এতগুলো কথা শুনে সব প্রশ্নের উত্তর মনে এলো না। বললাম : একটা ওষুধের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামান্য যুক্ত আছি। এটাই পেশা। আর নেশার মধ্যে বাবার আমলের একটা ভাঙা প্রেস আছে তা নিয়ে সকাল-বিকেল বসি। সামান্য সাহিত্য করি। গান ভালবাসি। গানের আসরেই তো মুক্তিবাবুর হাতে আমি ধরা পড়েছি।

তাঁর অনুরোধ-তা বাবা আজ একটু গান হোক না। আমি ভক্তিগীতি ভীষণ ভালবাসি। বেতারে ভক্তিগীতি আমি রোজ শুনি। সারাটা দিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর গান হলে

যেন হৃদয়ে মধুবর্ষণ হয়। সেই মহান অমৃত তুমি আস্বাদন করেছ। ওনার মুখে তোমার অনেক কথা শুনেছি। একটু বসো বাবা। আমার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দিই। ওরে বন্নু, কোথায় গেলি? তোর সোমেনদা এসেছে রে! তুই গান শুনবি বলেছিলি? অমর কোথায় গেল? জানো বাবা, মেয়েকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট করবো। আর ছেলেকে করবো ডাক্তার।

এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো ডাক্তারবাবু তাকিয়েছিল সৌমেন্দুর দিকে। হঠাৎ ডাক্তার শব্দটির উচ্চারণ শুনে বলতে লাগল: জানেন সৌমেন্দুবাবু, আমি প্রথম ডাক্তারী করতে গিয়ে আর, এন, হাসপাতালের এক রোগিণীর প্রেমে পড়ি। সেখান থেকে আর উঠে আসতে পারলাম না। আপনিও সে ফাঁদে পড়েছেন। মেয়েরা যাকে একবার ভালবাসে সহজে ছাড়তে চায় না। জানেন তো: নারী মরে সেইদিন যেদিন সে ভালবাসে কোনো পুরুষকে। ওদের মতো গভীর প্রেম পুরুষের থাকে না।

"দূর মশাই"—কথার মাঝে বাধা দেয় সৌম্য। কি হলো তারপর শুনুন। অর্ধেক না শুনেই·········

বিরক্তভাব দেখে ডাক্তার হেসে বলেন—আচ্ছা, বলুন।

তারপর আর একদিন অনেক পীড়াপীড়িতে গেলাম। সেবার আর অনুরোধ এড়াতে পারিনি।

ডাক্তার বলে 'এটা খুবই স্বাভাবিক। মানে ফাঁদে পা······ হ্যাঁ বলুন তারপর'—?

সৌমেন্দু বলে চলে: দেখি আমার গানের শ্রোতা অনেক। অনেকে গান শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব। শ্রোতাদের পোষাক আর চালচলন অশোভন লাগল। আমি ঠিক তখন পরিবেশটাকে মানিয়ে নিতে পারিনি। যাহোক ভদ্রমহিলার বিশেষ অনুরোধে একটা গান শুরু করলাম। খুব আবেগভরা কণ্ঠে:

প্রেম-সাগরে অবোধ আমি আমায় নিয়ে কেন কর খেলা,
শুন্দরেরই অরূপ রতন খুঁজেছি কত নিত্য বেলা।
আজ এই আসরে দেখছি কত অরূপ মুখের মধুমেলা
চেনা অচেনার ভীড়ে নতশিরে আমি সয়ে যাব অবহেলা॥
প্রেম সাগরে অবোধ আমি············

গভীর আবেগভরা কণ্ঠে ডাক্তার বলে: বা! বা! অপূর্ব গানের কলি তো! কি হলো, উদাসভাবে কি দেখছেন?

সৌমেন্দু নিজেকে ফিরে পায়। বলে: সে এক করুণ স্মৃতি। শ্রোতাদের মধ্যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। হঠাৎ পাশের একজন শ্রোতা গানের মাঝে হো হো করে হেসে উঠল। আশ্চর্য! তার পাশের সাঙ্গোপাঙ্গরা মেয়েটাও তাকে অনুকরণ করল। জানেন, আমার ভীষণ বিরক্তি লাগল। সেই একটাই গান হয়েছিল। পাশের সব সঙ্গীত-রসিক মুখোসপরা শ্রোতাদের বেশ ভাল করেই সেদিন চিনে নিয়েছিলাম। তারপর আর যাইনি। তবে ও বাড়িতে যে বাজে ছেলেদের আনাগোনা হয় তা আমার একটা তুচ্ছ দিনের স্মৃতিতে জমা আছে। পরে অবশ্য মুক্তিবাবুও এ প্রসঙ্গে ও পাড়া সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন।

কথা চলছে, এমন সময় জনৈক রোগী এসে বলে: ডাক্তারবাবু, ও পাড়ার মিত্তির মশাই কলেরায় যায় যায় অবস্থা। আপনি এখুনিই চলুন।

সৌমেন্দুর সম্মতি নিয়ে ডাক্তার চলে যায়।

[৩]

বাইরে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ তখন নৃত্যরত। ফুলের মধুর গন্ধে চারিদিক আমোদিত। কখনও বা আকাশ দুঃখে গুমরে উঠছে। অন্ধকার নামছে। বাতাস বইছে। বাইরের জানালা দিয়ে কল্পনার ভেলা ভাসিয়ে দেয় সৌমেন্দু। খুলে দেয় তার গণ্ডীবদ্ধ মনকে। সেই গান আর স্ত্রীর আকর্ষণ চুম্বকের পাহাড়ে মনের জাহাজটা আটকে যায়। শত সম্পদে শোভিত জাহাজ আটকা পড়ে। মন-সমুদ্রে ঝড় তুলে প্রসপারো ক্যাদিনান্দকে

ধরতে চেষ্টা করে। মায়াবী মন্ত্রে। হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া এসে চিন্তার স্রোতকে বিপর্যস্ত করে দেয় : না, যদি না যেতাম ভালই হতো। ওসব ফন্দী। ওরা ছেলে ধরা। ভাল ছেলেকে ধরে রাখবে ওদের মনের ঝোলায়। অনেক মানুষের সঙ্গে না মিশলে ঠিক মানুষ চেনা যায় না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তুচ্ছতা থাকে। মনের যত গভীরে প্রবেশ করা যায় মানুষের মেকি জিনিসগুলো, ফাঁকিগুলো সহজে ধরা পড়ে। সাজানো মানুষ জীবন নিয়ে অভিনয়ে সদা ব্যস্ত। মুখ আর মন এক না হলে মানুষের পবিত্রতা থাকে না। মোহের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকলেও মাতাল আসল মদের স্বাদ পরে বুঝতে পারে ঠিকই। ওদের মনের গোপন বাসনা জানার পর না যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু আমার ছেঁদো আদর্শ আমাকে হত্যা করলো। আমি শিক্ষক নিযুক্ত হলাম। তখন আর্থিক সংকট ভীষণ। টাকার দরকার খুব। আমাকে টাকা দিয়ে বাঁধলো ওরা। তিন দিনে হবে না ছ'দিনই—পঞ্চাশ নয় একশো। তাই ভাবি বাবা থাকলে আজ এভাবে কেনা গোলাম সাজতে হতো না। হঠাৎ আকাশ কেঁদে উঠল।

ডাক্তার ফেরে বিষণ্ন বদনে : আর বাঁচানো গেল না।

সৌমেন্দু চিন্তা ফেলে উদ্গ্রীব হয় : কাকে ?

না, না, ভয়ের কিছু নেই সৌমেনবাবু, ভীষণ মড়ক লেগেছে। অনেক লোকই মরছে। উপায় নেই। সৌমেন্দু ওঠার জন্য ব্যস্ত হয়।

আর একটু বসুন। আর একবার মুক্তিবাবুর কাছে যাবো। ওষুধটা তৈরি করছে। তারপর যাবো। আমি তো এসে দেখি 'একলা জগৎ ভুলে পড়ে আছি নদীকূলে...........' নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন দেখলাম। এত চিন্তার কি আছে—মনে আগুন জ্বলছে ও সুধাবারি কোমল হাতে বর্ষিত না হলে সমস্যা যাবে না। বুঝলেন। অযথা নিজে অশান্তি পাচ্ছেন, মনস্থির করে ফেলুন, আপনি আরও প্রতিষ্ঠিত হবেন।

সৌমেন্দু বলে,—কি জানেন ডাক্তার, মানুষের যত রকমের শাস্তি আছে মনের অশান্তি সবচেয়ে ভয়াবহ। মনে ঘা দিয়ে কথা বললে মানুষ যতখানি অসন্তুষ্ট হয়, যতটা দুঃখ পায়, দু'ঘা পিটলে তার ততখানি লাগে না। আজ মনের অশান্তিতেই আমি ক'দিন ধরেই জ্বলছি। এর চেয়ে বড় শাস্তি আমি পাই নি। অথচ আমার আর্থিক সংকটের সুযোগ নিয়ে আমাকে আমার বিবেক-বর্জিত বহু কাজ এরা করিয়েছে। পরে আমি যখনই প্রতিবাদ করেছি আমার নামে ওরা যা তা বলেছে। এমনকি বাইরের ছেলে এসেও আমাকে অপমান করে গেছে। তারা এতো সাহস পেলো কোথা থেকে? জানেন, আজ মনটা ভীষণ খারাপ, আর আপনি যখন মনেরই রোগ সারান তখন বলতে কুণ্ঠা নেই আমার জীবনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা। আমি যখন গান নিয়ে ভীষণ মাতামাতি করতাম তখন একটু বেশি সিনেমা দেখতাম গান তোলার জন্যে। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' তখন হিট বই। শুনলাম পরের দিনই আমাকে ওদের পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় যেতে হবে। বাধা দিলাম। বললেন : যে তিন ঘণ্টা পড়াও ঐ তিন ঘণ্টা সিনেমায় থাকতে আপত্তি কি আছে? ওসব চলবে না। বন্যা তখন নাছোড়বান্দা। উপায় খুঁজে পেলাম না। স্থির হলো ভদ্রলোক যাবেন না। মা ও মেয়ে যাবে; নির্দ্দিষ্ট সময়ে গেলাম। দেখি মা যাবেন না। মেয়ে একা যাবে। খুব খারাপ লাগল। কি করবো? অনেক চিন্তা করলাম। পথ খুঁজে পেলাম না। মা যদি জানতে পারেন, আমার প্রেসের লোকেরা যদি জানে? কি······

ডাক্তার বলেন কথা কেড়ে নিয়ে—মেয়েটির সঙ্গে যেতে বাধ্য হলেন এই তো? ভালই হতো তো? সঙ্গে নায়িকা, আর কি? সমস্যা তো দেখলাম না। তারপর·········তারপর·········তারপর সেদিনের অনেক স্মৃতি অনেক কথা·········আমি যে নরকে যাচ্ছি সেদিন থেকেই জানতে পারলাম। বন্যার মুখ থেকে অনেক কথা নতুন করে শুনেছি। পাঁকে পড়ে যে মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমার নিজের জীবন দিয়ে তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।

উঠলও কিছুটা। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। সেই সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আমরা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ঘুরলাম। বাড়ির গাড়ি এলো না। শুনেছিলাম ড্রাইভারের নাকি অসুখ করেছিল। ওর জীবনের কলঙ্কময় অধ্যায়ের সব কথা ও সেদিন খুলে বলেছিল। শুনে খুব দুঃখ হয়েছিল। নিজের জীবন দিয়ে ওকে বাঁচাবো এই স্বপ্ন ছিল আমার। ওর মনের পরিবর্তনের জন্যে শুধু সিনেমা নয়, আমি গেছি বেলুড, দক্ষিণেশ্বর, চিড়িয়াখানায়, তারকেশ্বরে। ওকে পরিবর্তন করবো, সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেবো, নিজের জীবনে যা পারিনি ওকে তাই দিয়ে গড়ে তুলবো। ভীষণ নিষ্ঠা নিয়ে পড়াতে লাগলাম। মনের পরিবর্তনের জন্যে বিভিন্ন শিক্ষামূলক স্থানে নিয়ে যেতাম। এরকম কথা কখনও শুনেছেন, চিড়িয়াখানায় গেছি ; দেখলাম সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বললাম : ডায়িং সান পড়েছ ?

না, ও ছোট্ট করে উত্তর দিল।

এইভাবে সূর্য কিরণ দিতে দিতে আস্তে আস্তে এমন একটা দিন আসবে যখন তার সব কিরণ শেষ হয়ে যাবে। পৃথিবী আলোকশূন্য হয়ে যাবে। পৃথিবীর নিজস্ব আলো নেই। আমরা সকলে মরে যাবো। কে···উ বাঁচবে না।

আমরা দু'জনেও ? বন্যার গলায় কিছুটা আবেগ মেশানো।

সেই রোমান্সভরা চোখের বিস্ময় ডাক্তারবাবু আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না। এ ভাবের জিনিস, অনুভবের বস্তু। সেই দু'জনের স্বপ্ন আমরা দেখলাম। প্রতিটি দিন একবার অন্ততঃ যাওয়া চাই। আমি ওদের বাড়ির মানুষ হয়ে গেলাম। সন্ধ্যায় আমার নিজের বাড়িতে খাওয়া উঠে গেল। ওরা রোজ খাওয়াতে লাগল। ভাত, মাছ, মাংস, পোলাও, রসগোল্লা, দই, সন্দেশ, রাবড়ি, কি নয় ? মাকে বলতাম :

চিন্তা নেই, তোমার ছেলে হাতছাড়া হবে না।

না, না, তা নয়, সে বিশ্বাস আছে বাবা, কিন্তু আমি একা মানুষ তুই এত রাতে আসবি, খাবি না, আমার একা খেতে ভাল লাগে না।

অনেকদিন রাতে রান্না বন্ধ হয়েছে। ফেরার পথে খাবার কিনে এনে আমাদের রাত কেটেছে। তবু ওদের অসন্তুষ্ট হতে দিই নি।

তাহলে দারুণ ঘনিষ্ঠ হলেন……

হঠাৎ কম্পাউণ্ডার ওষুধের শিশিটা এনে টেবিলে রাখলেন।

চলুন আবার পরে হবে।

না, না, শেষে কি হল ?

এই তো সবে শুরু। কিন্তু কি জানেন শুরুতেই গোল বাধলো। এতখানি ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করলেন না মুক্তিবাবু। এতখানি ঘনিষ্ঠতাও তিনি চান নি। স্ত্রী চাইতেন, মেয়ে চাইতো। তাই কি সব কথা বাবা আমার নামে বলতো তা গোপনে রোজ লিখে পাঠাতো। পড়তাম। ভীষণ রাগ হত। রোজই ভাবতাম : যাবো না। কিন্তু পারতাম না। অদৃশ্য শক্তি আমাকে টেনে নিয়ে যেতো।

আরে মধু থাকলে ভ্রমর আসে—ডাক্তার চিমটি কাটে।

সৌমেন্দু বলে : কিন্তু এ ভ্রমর পরাগ মিলনের জন্যে আসে নি। এসেছে ফুলের সৌন্দর্য দেখতে। বাঘের গায়ের কালো কালো চাকা চাকা দাগ দেখতে ময়ুর খুব ভালবাসে। তাই বাঘ যেখানে থাকে ওরা সেখানে যায়। মৃত্যু অনেকের হয়, তাতে ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। সৌন্দর্যই বড় কথা। আমি এই পথেরই পথভোলা পথিক। ডাক্তার ঘাড় নাড়ে। টাইটানিক তখন আস্তে আস্তে ডুবছে। লাইফবোটে প্রাণভয়ে যাত্রীরা পালাচ্ছে। সেই নির্জন নিশীথে আট্‌লানটিক মহাসাগরে আলোকোজ্জ্বল সুন্দরী মনোলোভা টাইটানিক-নর্তকীকে ছেড়ে বেশ কয়েক জন যেতে চাইল না। সৌন্দর্য এমনই জিনিস। মৃত্যুকে ভয় কি ?

সাবাস! আপনার আদর্শ আর নিষ্ঠা দেখে বিস্ময় বোধ করি। তারপর কি করলেন ?

মুক্তিবাবুর ওপরে ভীষণ রাগ হলো। তিনি হয়ত একটা ব্যালেন্স কষতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘর না সামলে পরকে

সামলাতে গেলেন। চালে ভুল করলেন। বাড়িতে একটা অবাঞ্ছিত ছেলেকে একদিন ডেকে আনলেন।

বলেন কি সৌমেন্দুবাবু—ডাক্তার বিস্ময় প্রকাশ করে।

হ্যাঁ। —সৌমেন্দুর কণ্ঠে দৃঢ়তা।

মানুষটার ওপর থেকে সব রকমের বিশ্বাস আর আস্থা হারিয়ে ফেললাম সেদিন। শুধু চিঠিগুলোর কথা মনে পড়ে।

আপনার মনে আছে? —ডাক্তার যেন বিস্ময়বোধ করে।

সৌমেন্দু—তা প্রায় সব।

ডাক্তার কৌতূহল প্রকাশ করে—আচ্ছা............অবাঞ্ছিত বলতে?

সৌমেন্দু সঙ্কোচ করে—মানে......তা ঠিক নয়। জন্ম দিয়েই আজকের সমাজের মাপকাঠি হয়। কিন্তু আমি এটা মানি না। এ বুর্জোয়া ভাবধারা আজকের সমাজে চলে না। এই অজুহাতে অর্জুনের চেয়েও বড় বীর কর্ণকে আপনারা নির্মমভাবে শাস্তি দিয়েছেন। একলব্যকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে দেন নি। মানুষের বিচার হবে তার কাজে, বংশে নয়।

কিন্তু সৌমেন্দুবাবু ভুলে যাচ্ছেন আপনি যে বস্তিবাড়ির রকবাজটার কথা উচ্চ আদর্শের মোহ নিয়ে বিচার করছেন তা সম্পূর্ণ ভুল। ওরাও আমার পেসেন্ট। ভুলে যাবেন না। আপনি এ অঞ্চলে দু'দিন আসছেন। মায়ের কাছে মামার বাড়ির কথা নাই বা বললেন। সঙ্গীতের সময় ওই বাঁদরটাইতো হেসে উঠেছিল। নিজেকে বড় বেশি ভেবে ফেলেছে। ভেবেছে প্রতিষ্ঠিত বাড়ির একটা মেয়েকে অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করে ফেলেছি। ওর আকাশছোঁয়া সাহস। অশোভন কাজের জন্য, চরিত্রের ভ্রষ্টতার জন্যে ওদের বাড়ির কত লোক পুলিশ হেফাজতে গেছে জানেন? পুলিশী হামলা কতদিন ও বাড়িতে হয়েছে জানেন? ওসব ছেঁদো মেকি আদর্শের কথা রাখুন। তাছাড়া ওর কি আছে? জানেন টেবিলে ছুরি পুঁতে রেখে ম্যাট্রিকুলেশন সম্পূর্ণ নকল করে পাস করেছে। ভাব দেখলে মনে হয় যেন বিশ্বজয় করেছে। ওসব

ছেলেকে জব্দ করা এমন একটা সমস্যা নয়। নার্ভ ষ্ট্রং করুন। সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। এত অল্পে ভেঙে পড়লে চলবে না। সংস্কৃতি চর্চা করে মনটাকে ভীষণ কোমল করে ফেলেছেন। জগৎটা এত সহজ আর সরল নয় বন্ধু। বাঁকা চোখের চাউনীতে জগৎ চলছে, ঘুরছে। সোজা পথে গেলেই মৃত্যু। আজকালকার ইয়ং রকবাজদের এত উদার চোখে দেখলে বিপদে পড়বেন।

বাইরে তখন আলো আঁধারের খেলা চলছে। রোদ কমছে। মেঘ উঠছে। মেঘ ঘুমাছে। রোদ জাগছে। ডাক্তার হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকালেন: না, চলুন আর একবার দেখে আবার বাড়ি ফিরতে হবে তো·········।

*   *   *   *

ডাক্তারকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে রুগ্ন ঘাড়টা তোলেন মুক্তি-বাবু: এখুনিই খুন করবো। আমার সৌমেন্দুকে ভুলিয়ে কোথায় রেখেছেন? ওকে জোর করে এ বাড়িতে এনে ওর কত ক্ষতি করেছি তা জানেন? ওর মতো একটা জ্বলন্ত প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটিয়েছি। ডাক্তার, আর হয়তো বাঁচবো না........ওকে তাই ক্ষমা করতে বলবো........ক্ষমা চাইবো। সহসা উত্তেজিত হয়ে বলেন—ওকে ফিরিয়ে দাও। নইলে তোমায় খুন করবো।

—আঃ তুমি এতো উত্তেজিত হচ্ছ কেন? ও আবার আসবে।

—ও সব তুমি বুঝবে না। মেয়েরা ওসব ছেলেদের মন বুঝতে পারে না। তোমরা বিষয়ী মানুষের মন ভাল বোঝ।

মুক্তিবাবু রেগে গেলেন, ডাক্তার এখনই না ওকে ফিরিয়ে দিলে তোমার বিপদ হবে বলছি।

—আঃ এত উত্তেজিত হবার কি আছে? আমি······আমি ······ডাক্তার থামাবার চেষ্টা করে।

—এখুনিই আনতে হবে। নইলে·········

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে ওঠে—আপনার প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে আর বাঁচানো যাবে না।

তিনি বাধ্য হয়ে সৌমেন্দুকে আনবার জন্তে চেম্বারে পাঠায়। তারপর বোঝাতে থাকে : যদ্ ভাবি তদ্ ভাবি……… । ভাগ্য আর ভবিতব্যকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না। আমি সৌমেন্দুর সঙ্গে কথা বলেছি। আপনার দুশ্চিন্তা নেই। সব সমস্যা দূর হবে। যতদিন না রোগ সারে, ও……

মুক্তিবাবুর চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে। কি যেন অসম্ভব বস্তু পেয়েছে। ডাক্তারের হাত ধরে বলতে থাকেন—জানেন,—আমার কত বড় আশা ছিল, ওকে আমার জামাই করবো। সব আশা নষ্ট করে দিল আমার মেয়ে আর স্ত্রী। ছেলেটা আজও বিয়ে করেনি। আর আমার মেয়ে তার বয়ফ্রেণ্ডদের নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করে যাচ্ছে। আরে ঐ রকম বাড়ি, মা, ঐ ধরনের ছেলে আর পাব? কত সাধনা করে ডাক্তার ছেলেটাকে সংগ্রহ করলাম। এ পাড়ার অন্য সব ছেলের সঙ্গে তার তুলনা চলে? একথা ওদের বোঝাতে পারলাম না আজও। আমার স্ত্রী পরে বুঝেছিল। তাই রোজই নানান অছিলায় ডেকে পাঠাতো। মেয়েকে নিয়ে ওর সঙ্গে অনেক জায়গায় যেতো। কিন্তু পাড়ার ঐ রকফেলারটা আমার মেয়েটার মাথাটা খেলো। অথচ ঐ বাঁদরটা যা কিছু উন্নতি করলো তা সবই আমার মেয়ের উৎসাহে আর অনুপ্রেরণায়।

ডাক্তার সান্ত্বনার সুরে বলে—আমি এসব কথা জানি মুক্তিবাবু। ওসব কথা পরে আরও শুনবো। আপনি একটু চুপ করে থাকুন। প্রেসারে উত্তেজনা ভাল নয়। নার্ভে টান পড়লে ক্ষতি হবে। সৌমেন্দু এখুনিই আসবে।

[৪]

সৌমেন্দু আসে, উসকো-খুসকো চুল। চিন্তাবিষণ্ণ মুখ। মুক্তিবাবুর বিছানার পাশে তাঁর ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে বসে থাকতে দেখে বিস্ময়বোধ করে। বাইরে বাতাসের তীব্র আলোড়ন। ঝড়ো হাওয়ার উন্মাদ নৃত্য। ডাক্তার পরিস্থিতিটা ভাল করে লক্ষ্য করে নেয়। ছেলেমেয়ে বাবার পাশে থাকে। স্ত্রী পায়ের কাছে। সৌমেন্দু বসে মাথার কাছে। মাথায় হাত বোলাতে থাকে।

শেষে ডাক্তার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। চিন্তার পর বলে : সৌমেন্দু-বাবু, আপনি মুক্তিবাবুর কাছে কিছুদিন অন্ততঃ একবার করে আসুন। শুধুমাত্র ওষুধ আর পথ্যে ওঁনার অসুখ কোনোদিন সারবে না। অসুখের সময় রোগী যাকে ভালবাসে সে কাছে থাকলে রোগমুক্তি তাড়াতাড়ি হয়। আপনি অন্ততঃ ক'টা দিন আসুন উনি খানিক সুস্থ হয়ে উঠুন, কাজকর্ম করুন, তারপর আসা বন্ধ করে দেবেন। অমত করবেন না। আমার কথা রাখুন— ডাক্তার মিনতি করে।

মুক্তিবাবুর স্ত্রীর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। মুক্তিবাবুর কোটরে-ঢোকা চোখদুটো জ্বল জ্বল করে উঠল। পাশে বন্যা এতক্ষণ সুযোগের অপেক্ষা করছিল : আপনি আমায় ক্ষমা করুন সৌম্যদা। আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমার জন্যেই হয়তো আপনার উন্নতি হয় নি। অনুতাপের অনলে এই একটা বছর কিভাবে যে দগ্ধ হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তবু মুখ ফুটে তার প্রতিবাদ করতে পারি নি। আপনাকে অনুধাবন করার মতো মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। আপনার সঙ্গে আমি এতদিন অভিনয় করে এসেছি। সত্যি বলছি বিশ্বাস করুন, আজ সব অভিনয় শেষ হয়েছে। নকল পোষাকপরা নায়ককে খুব ভাল করে চিনতে পেরেছি। আমায় ক্ষমা করুন সৌম্যদা। আমি বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, আমাকে বাঁচান—বন্যা কাঁদতে থাকে।

সৌমেন্দু খুব শান্ত সুরে বলে : যৌবন একটা ঝড়। কাল-বৈশাখীর মতো সে উদ্দাম, সে উচ্ছল। কারো বাধা মানে না। তখন বাবা-মা-পরিজন-শিক্ষক—সকলেই তার চোখে অবজ্ঞাত। অথচ পরিবারের লোকেরা প্রথম থেকেই যদি কঠোর নিয়ন্ত্রণ করে তাদের পথ ও মতকে স্থির করে দেয় হয়ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে। তা অধিকাংশ অভিভাবক করে না। বাইরের সাজ-পোষাকের চমক দেখে আর মেকি আভিজাত্যের কিছু বাঁধা বুলি শুনে তারা আকৃষ্ট হয়। সৌমেন্দু ইতস্ততঃ করে বলে—যাক নিজের পথ আর মত ঠিক করেছ জেনে খুব খুশি হলাম।

স্নান সেরে সৌমেন্দু খেতে বসেছে। মুক্তিবাবুর স্ত্রী নানা ধরনের রান্না করতে জানেন। অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েক পংক্তির রান্না করেছেন। সৌমেন্দুর পাশে বসে পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। জোর করে খাওয়াতে লাগলেন। সৌমেন্দু ভাবে অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। কতদিন এই ঘরে আর এই বাসনে সে খেয়েছে। কত স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো এই গ্লাস আর প্লেটটা। খাওয়া নিয়ে কত বাজে বিবাদ, ছোট-খাটো অশান্তি, মান অভিমান। ঝগড়া করে কতদিন খায়নি বন্যা। মুক্তিবাবুর স্ত্রী তাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। বলতেন: আরে, ছেলেরাইতো সম্পদ, টাকা-পয়সা। ওদের ভাল···না···বাসলে কাকে বাসবো বল! সৌমেন্দুর মতো ভাল ছেলে এই চত্বরে কটা আছে বল? তোদের তো ও মানুষ করতে এসেছে। এখনও অমানুষ আছিস্।

এই অসুস্থ ঘরে আবার অনেকদিন পরে রাশিখানেক খাবার দেখে সৌমেন্দু বলে: আজকের খাবারগুলো খুব মিষ্টি লাগছে, জানি না অনেক দিন পরে খাচ্ছি বলে বোধ হয়। আপনাকে দেখলে আমার অনেক কথা মনে পড়ে।

কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বলেন—তাতো মনে পড়বেই বাবা। সে সব কথা কি আর ভোলা যায়।

সৌমেন্দু সুরু করে: কিন্তু ছন্নছাড়া জীবনে স্মৃতিটুকুই তো সম্বল, নইলে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আসবে কি করে? ঘরমুখো মানুষের সংখ্যাই তো বেশি। সেজন্য রবি ঠাকুরের অমলকে আমার খুব ভাল লাগে।

মুক্তিবাবুর স্ত্রী বলেন—তোমাকে স্নেহের বাঁধনে বেঁধে রাখবো সৌমা। সেই বাঁধন খুলে যেতে তুমি পারবে?

খাওয়া আর তার সঙ্গে আমেজী গল্প চলছে এমন সময় প্রলয়ের হঠাৎ উপস্থিতিতে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থেমে যায়। বন্যা উঠে পড়ে। অমরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সৌমেন্দুর খাওয়া বন্ধ হয়। প্রলয় একবার খাওয়ার আয়োজনটা ভাল করে

লক্ষ্য করে। বন্যাকে সৌমেন্দুর পাশে বসে থাকতে দেখে। অন্তরালে থেকে কিছুটা রঙ্গরসিকতাও শোনে। অবস্থাটা অনুধাবন করতে তার বেশি সময় লাগে না। চকিত আবির্ভাবের হেতুটা জানিয়ে দেয় প্রলয় : ক'দিন ধরেই শুনছি মুক্তিদার অসুখ, বন্যার একটা চিঠিও পেলাম। ভাবলাম পাড়ার মানুষ হিসেবে তো একটা কর্তব্য আছে। তাছাড়া এই বাড়িতে বসে কতদিন রাজনীতি নিয়ে উন্মাদের মতো পরিশ্রম করেছি। আপনাদের সঙ্গে এই ঘরে বসে রঙ্গরসিকতাও করেছি। আজ আমি ফেলনা, নোংরা·· তাই আমার এই ঘরে আসতে মানা। কিন্তু চিন্তা করে দেখেছেন কি ছেলেরা খারাপ হয় কাদের জন্যে? আজ-কালকার মেয়েরা এক-একটা পাকা শয়তান। তারা প্রথমে সাধারণ ছেলে ধরে। তারপর হাতের কাছে যত নিরীহ বোকা প্রতিষ্ঠিত ছেলে পায় শাড়ির মতো তত হাতবদল করতে চায়। মরে কারা জানেন? এই আপনার মতো প্রতিষ্ঠিত সহজ সরল বোকা ছেলেরা। আজ আপনাকে ওরা এতখানি যত্ন করছে, জামাই-আদর করছে আবার কাল আপনার চেয়ে আরও প্রতিষ্ঠিত ছেলে পেলে আপনাকে ওরা পাত্তা দেবে? এসব দেখে আমি দারুণ ফেরোসাস হয়ে গেছি। মেয়েদের জীবন নিয়ে আমিও উপভোগের বন্যা বইয়ে দেবো। দেখি না ক'টা মেয়ের সর্বনাশ করতে পারি। সৌমেন্দুকে বিনীত হয়ে বলে : দাদা, কিছু মনে করবেন না। সেই গানের আসরে প্রথম আলাপ হয়েছে ; তারপর বহুদিন আপনাকে আর দেখতে পাইনি। মাঝে বোধ হয় পড়ানোর একটা ছুতো নিয়ে দিন-রাত এখানে কাটিয়ে-ছেন। তারপর কৃষ্ণের মান-অভিমান-অনুরাগ-বিরাগ। আমি সঙ্গীত আর সাহিত্য কোনোদিন করিনি। করবো কখন? সকালে আর সন্ধ্যায় রকের আড্ডা তো ছাড়তে পারি না। ঘুষ দিয়ে আর জাত পাল্টে একটা সরকারী চাকুরী জুটিয়েছি। সেখানেও দুপুরে বেশ ঘুম দিচ্ছি। আপনার মতো আদর্শবাদ আমি পছন্দ করি না। জোর থাকে ছিনিয়ে নাও—এই আদর্শে বিশ্বাস করি মশাই।

সৌমেন্দু একটু হেসে বলে : বা! আপনার মধ্যে বেশ বিদ্রোহের আগুন দেখছি।

দেখবেন না কেন? এই অন্যায় ভালবাসার ব্যবসা, এই প্রেমের অভিনয়কে আমি ঘেন্না করি। জানেন—এরা জানে, প্রথম জীবনে সত্যকার মনপ্রাণ সমর্পণ করে কতদিন ধরে একটা মেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করে তুললুম। শেষে তার বাবা-মা আমাকে লোফার-লম্পট বলে তাড়িয়ে দিল। সেই শিক্ষা আমাকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। বাধ্য হয়েছি বিদ্রোহী হতে।

কিন্তু আপনি···অন্য একটা কাজ করতে পারতেন।···বসুন, বলছি···আজ যারা নিরপেক্ষ আছে—ধরুন কোনো পক্ষের মানুষ নয়, আপনার বা আমার পক্ষেরও নয়, তাদের আঘাত হানুন। দেখবেন খুব ভাল ফল ফলেছে। হয় আপনাব পক্ষে আসবে, না হয় আপনার বিপক্ষে যাবে। যদি পক্ষে যায় আপনার শক্তি বাড়বে, আর বিপক্ষে গেলে আপনার কতখানি শক্তি আপনি বুঝতে পারবেন।

এজন্যই তো শিক্ষিত ছেলেদের ভাল লাগে। তাদের বাস্তব জ্ঞান নেই। শুকনো পাতা গাদাখানেক মুখস্থ করে। কিন্তু ভাই, বাস্তব বড কঠিন। যাক্ ওরা আবাঁর বিরক্ত বোধ করছে। উঠি, পরে দেখা হবে।

প্রলয় চলে গেলে কারো মুখে কথা নেই। সৌমেন্দুর উপরে বেশ কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়। ভাবে এত বাজে কথা বলার কি প্রয়োজন ছিল?

* * * *

দিন যায়। মাসও গড়িয়ে যায়। পিতৃহীন এই সংসারে সৌমেন্দু সমস্ত সমস্যার সামাল দেয়। পেনসানের সামান্য টাকা আর বাড়িভাড়ায় সংসার চলে না। সৌমেন্দু সর্বস্ব ত্যাগ করে এই সংসারের জোয়াল কাঁধে বয়ে যায়। শরতের পর হেমন্ত এল। সংসারের অভাব অনটন দূর করার জন্যে বন্যাও সচেষ্ট

হল। বি. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভাল ফল করে উত্তীর্ণ হয়। সৌমেন্দুর নিজের জীবনের অপূর্ণতা বন্যার এই সাফল্যে পূর্ণতা এনে দিল। সৌমেন্দুর চেষ্টায় স্থানীয় একটা গার্ল্‌স্‌ স্কুলে তার শিক্ষকতা করার ব্যবস্থা হলো। সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীতে এম এ-তে ভর্তিও হলো সে। বন্যাকে বড় করা আর তাকে প্রতিষ্ঠা করা তার জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়ালো। বন্যাও তার অতীত জীবনের তুচ্ছ স্মৃতি ভুলে যায়। সৌমেন্দুর সঙ্গে ভীষণভাবে মিশে যায়। মানসিক বিকাশের জন্যে নানান জায়গায় ওরা বেড়ায়। বন্যার পূর্ব ঘনিষ্ঠতার ইতিবৃত্তও মুছে যায়। এদিকে বন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে প্রলয় প্রায়ই ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে অন্য সুন্দরী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যায়। কখনও বা ভয় দেখায়। সৌমেন্দু বন্যাকে সাহস দেয়। প্রলয় বন্যাকে দেখতে পেলে নানান বিরূপ মন্তব্য করে। অন্য বন্ধুর মাধ্যমে নানান ভাবে পূর্বেকার সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে। সৌমেন্দু নিজের জীবন দিয়েও বন্যাকে রক্ষা করার সংকল্পের কথা জানায়। সঙ্গীত দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চায় তাকে। দুটো উজ্জ্বল জীবনের সমন্বয় স্থানীয় মানুষেরা আশা করেছিল। বন্যার মা-ও। উদাসীন সৌমেন্দু জীবনেক আর ভবিষ্যৎকে এত গভীরভাবে কোনোদিন ভাবেনি। নিছক ছাত্রী, বড় জোর বন্ধু হিসেবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার মহান দায়িত্ব সে বহন করতে এসেছে মাত্র।

ইডেনে প্যাগোডার পাশে বসে বাদাম খেতে খেতে সেদিন বন্যা বলে : জানেন সৌম্যদা, আমার মা বলেছে, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে আর কিছুদিন পরে। এ ব্যাপারে আপনার মত কি ?

কি জানো বন্যা, ছেলে হয়ে জন্মেছি, জীবনের পঁচিশটা বসন্ত কাটিয়েছি। সংসারী হবার বাসনা হয়ত মাঝে মধ্যে জেগেছে সত্য, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি জানো তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে একথা আমি কোনোদিন ভাবিনি। তোমাকে অনেক বড় করে তুলবো। তুমি সংসারের হাল শক্ত হাতে ধরবে,

ভাইকে ডাক্তার করবে। তারপর আমার চেয়ে আরও ভাল ছেলে পাবে তাকে গ্রহণ করবে। চিন্তা করে দেখো তো, তুমি যদি আমার নিজের বোন হোতে, আমি কি সেই চিন্তা করতাম না। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি সত্যই প্রণয়দাকে কোনোদিন ভালবেসে থাক, আমার মনে হয়, ওকে বিয়ে ক'রো না। ওরা বস্তিবাড়ির ছেলে বলে, রকে বসে দিনরাত আড্ডা দেয় বলে, চুরি-জোচ্চুরি করে পাশ করেছে বলে, পরিবারের কলঙ্ক আছে বলে ওকে ত্যাগ করা ঠিক নয়। ভালবাসার ক্ষেত্রে এই সব বাধা না থাকাই উচিত। চিন্তা করে দেখো তো শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নিরুপমা দেবীর বিয়ে হল না সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাবে, একই বর্ণের হয়ে উচ্চনীচের পার্থক্য থাকায়, আর শরৎচন্দ্রের ভবঘুরে জীবনের জন্যে। বিয়ে মানে কি সমাজের মিল ? বর্ণের মিলন ? উভয়ের হৃদয়ের আর মনের মিল কি বড় কথা নয় ? আমার মনে হয়, বিয়ের সময়ে অন্তত ছেলে মেয়েদের স্বাধীন মতামত নেওয়া উচিত। বিয়ে যখন তারা করবে, এটা যখন তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তখন বাবা-মার অহেতুক হস্তক্ষেপ সব সময় ঠিক নয়। তবে এটাও ঠিক, উদ্দাম যৌবনে ভালমন্দের বিচার করার মতো মন সকলের থাকে না। চোখে-মুখে থাকে মোহ। সে ক্ষেত্রে যারা পৃথিবীতে আনে, মানুষ করে, তাদের দায়িত্বের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমি তো পার্বতীর সঙ্গে দেবদাসের বিয়ে না হবার জন্যে দারুণ-ভাবে দুঃখ পেয়েছি। দেবদাসের ঐ করুণ পরিণতি কি কাম্য ছিল ? হতভাগা সমাজের তৎকালীন কঠোর অনুশাসনকে আমি ঘৃণা করি। রমার সঙ্গে রমেশের সেই মধুর সম্পর্ক কি গড়ে উঠতে পারতো না ? আজ তোমার সঙ্গে যদি প্রণয়ের সেই ধরনের বাল্যপ্রেম গড়ে উঠে থাকে এবং কৈশোরে যদি তা গোপনে পরিণতি লাভ করে থাকে, আমার মনে হয়, ও-বিয়ে হওয়া অবশ্য কাম্য। তবে আজকালকার দিনে রকবাজরা প্রেম বলতে নিছক যৌবনকে উপভোগ করা বোঝায়। এই মনোভাবকে ঘৃণা করি। অন্যে কি ভাবে, জানি না। এ মনোবৃত্তি নিয়ে শুধুমাত্র একটা মেয়েকে বা ছেলেকে ভাল না বাসাই ভাল, বলে আমার

মনে হয়। সেজন্যে অনেক বাজে কথার জাল বুনলাম। যা সত্য, আমার যা হৃদয়ের কথা তাই বললাম। আমার চেয়ে ভাল ছেলে পেলে অবশ্যই বিয়ে করবে। সেখানে আমার কিছুমাত্র বলার আছে বলে মনে করি না। তবে বর্তমানে তোমার যা মনের অবস্থা, তাতে যাকে-তাকে বিয়ে করো না যেন, এতে তোমাদের সংসারের, বংশের যে গৌরব আর প্রতিষ্ঠা আছে তা সবই নষ্ট হয়ে যাবে। শুনবে আর একটা অদ্ভুত কথা।

বলুন।

তুমি তখন প্রলয়দার সঙ্গে খুব মেলামেশা কর। আমি সেই প্রথম বা দ্বিতীয়বার আসি। পথে একজন নব্য তরুণ বললো: আপনি ওদের বাড়িতে রোজ পড়ান, শুনলাম।

কই না তো?

তাহলে আসেন কেন?

পড়া দেখিয়ে দিতে।

বিকৃত স্বরে ছেলেটি বলে: পড়াশোনা ও করে? মনে হয় না। ঐ রকবাজটার পাল্লায় পড়ে ভাল মেয়েটা উৎসন্নে গেল। পোষাক লক্ষ্য করেন না! বাপ নেই। লজ্জা হওয়া উচিত। প্রেমের ভাণ করে অনেক ছেলের এইভাবে মাথা খেয়েছে। আপনার অনেক গুণ শুনেছি। খুব সাবধান বন্ধু! ওয়ান ষ্টেপ ফরওয়ার্ড, টু ষ্টেপ ব্যাকওয়ার্ড।

কথাটা শুনে খু—ব খারাপ লেগেছিল। তারপর ভীষণ ভাল করে পড়িয়েছি, তোমাকে দিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করিয়ে আজ তাদের ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছি। আর পোষাকের পরিবর্তন? ও তো তুমি নিজেই করেছ। তবে প্রেম নিয়ে বেসাতি বা ভালবাসার অভিনয় কোনোদিন করো না। এতে একদিন ভীষণ কষ্ট পাবে। জীবনে সুখী হবে না। যারা যত বেশি জীবন নিয়ে চালাকি করে তারা তত বেশি ঠকে মরে। পড়াশুনা করেছ। বিবেক জাগ্রত হয়েছে। ভালমন্দের বিচার করে মায়ের সম্মতি নিয়ে কাজ করতে অনুরোধ করছি।

—ওফ্‌! বিয়ের কথা বলে যে কি অপরাধ করেছি জানি না। এ যেন কলেজের একটা একটানা সোসিওলজির পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেকচার হলো। আর বলছি না কোনোদিন।

—বিয়ের কথা তুমি বলবে কেন? তোমার মা বলবেন। ভাল পাত্রের সন্ধান করা হবে। আত্মীয়রা আসবে। বিয়েতে নহবৎ বসবে। ছাদে প্যাণ্ডেল বাঁধা হবে। লোকজন খাবে, তবে তো বিয়ে। বলি, মুক্তিবাবু নেই বলে যে তাঁকে ভক্তি করতো সেই ভক্তা কি মরে গেছে? না সে ভিখিরীর ছেলে? যে তোমার বিয়েতে দশ হাজার টাকা খরচ করতে পারবে না? এক সময় না হয় গরীব ছিলাম। আজ গুণে দশ-পনেরো হাজার বার করতে পারবো না? আরে বোনের বিয়ে, ধার করেও তো করবো। ভাবছ কিছু?

—চলুন, আর ভাল লাগছে না। দেখুন, দেখুন (বিস্ময়ে) ও নেপালদা না? প্রলয়দার ভীষণ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ও বোধ হয় সব কথা শুনেছে। সর্বনাশ! কি হবে?

—কি আবার হবে? যা সত্য আমি তাই বললাম। তোমার কোনো ভয় নেই বন্নু। মৃত্যুর পথে হয়ত আমাকেই পা বাড়াতে হবে। আমার গতি বিধির ওপরে অনেক দিন ধরেই ওরা নজর রাখছে। আমি হয়ত থাকবো না। কিন্তু তুমি তোমার আদর্শ, পথ ও মতে অবিচল থেকো। মানুষ চিরদিন থাকে না। থাকে তার আদর্শ। সেজন্য মৃত্যুতে মানুষের শেষ নয়। সিজার পড়ালাম দেখলে তো, জীবন্ত অপেক্ষা মৃত সিজার কতখানি শক্তিশালী। টমাস বেকেটের কথাও তো বলেছি। আমি ·········আমার মৃত্যু হলে হয়ত আরও বেশি বড় হতে পারবো·········

[৫]

খেয়ালী প্রকৃতি হঠাৎ রুক্ষ হয়ে উঠল। খরায় হাহাকার সুরু হল। মাটি হল প্রাণহীন। গাছপালা জ্বলে যেতে লাগল। অন্নাভাব বাংলাদেশের দুর্দিনকে ডেকে আনল। প্রকৃতির এই রুক্ষমূর্তি দেশের বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করল। অন্যদিকে বিভিন্ন

দলের সমন্বয়ে গঠিত সরকারের মধ্যে শরিকী সংঘর্ষ বেধে গেল। সুরু হল সমাজবিরোধীদের ভয়াল তাণ্ডব—গৃহদাহ, নারীনির্যাতন, নারীহরণ, লুটপাট। বিরোধীপক্ষের প্রতিবাদের কোনো শক্তি ছিল না। শরিকদলের প্রধান মুক্তিফ্রণ্টে অবাঞ্ছিত লোকেরা এসে ভীড় করল। মুক্তিফ্রণ্টের নেতারা দল রাখার জন্যে তারা প্রতিবাদ করল না। অন্যান্য ছোটদল তারা নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। রাজনীতির মধ্যে মাৎস্যন্যায় সুরু হল। পথ-ঘাট অরণ্যের মত—নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। ভয়ে বাড়ির কেউ বাইরে বেরুতো না। অপেক্ষাকৃত ধনী লোকদের বাড়িতে অবাধে চলল লুঠতরাজ। নারীর সম্মান নিয়ে খেলা সুরু হল। পুলিশ নিরপেক্ষ রইল। মুক্তিফ্রণ্টের অধীন পুলিশ থাকায় নিজদলের যেখানে প্রভাব বেশি সেখানে তারা ঘাঁটাতে চাইল না। বিরোধী সমর্থকদের অবাধে নির্যাতন সুরু হল। দৈনিক সংবাদপত্রে এই সব অরাজকতার, ভয়াবহতার ছবি অত্যন্ত করুণভাবে তুলে ধরা হল। কিন্তু তারাও নিরাপত্তার জন্যে সকল সময়ে নিরপেক্ষ সংবাদ প্রকাশে আগ্রহী হলো না। একদিনে সমাজ জীবনে নিরাপত্তার অভাব অন্যদিকে চরম খাদ্যাভাব। চুরি-ডাকাতি ক্রমশ: বেড়ে যেতে লাগল। অবাধে পথে-ঘাটে খুন-জখম প্রকাশ্যে দিবালোকে চলতে লাগল। দেশে এক অসহনীয় অবস্থা দেখা গেল। মুক্তিবাবুর বাড়ির এই তিনজনকে রক্ষা করবে কে? স্বাভাবিক দিনে ওদের গলিতে আলো জ্বলত না। তার ওপরে সামাজিক অশান্তির হাত থেকে কে ওদের বাঁচাবে? সৌমেন্দু আশ্বাস দেয়। রোজ সন্ধ্যায় আসে। অনেক রাতে ফেরে। নিজের জীবন তুচ্ছ করেও ওদের বাঁচাবে। কিন্তু সৌমেন্দুকে বাঁচাবে কে? সেদিন রাতে সৌমেন্দু মায়ের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করে। মা জানায়: তোর ওপরে ওদের রাগ বেশি। তুই রোজ যাস্ না। হয়ত বিপদ হবে। বুঝলি?

সৌমেন্দু সাহসভরা চিত্তে বলে: তাতে কি আছে মা। একটা মহৎ আদর্শের জন্যে না হয় প্রাণ দেবো। তবু জানবো আমার আদর্শের জয় হয়েছে।

কথা কেড়ে মা বলেন,—আমি কি করে বাঁচবো তাহলে ?

হেসে বলে সৌমেন্দু : কেন আমার ব্যাঙ্কের টাকা, ইনসিওরেন্স তো তোমার পাওয়ার কথা। টাকার ভয় নেই। ওসব চলে যাবে।

টাকাই কি মানুষের বড় কথা বাবা ? মা মানুষ করে টাকার জন্যে নয়—তার সাধনার মূর্ত রূপ দেখার জন্যে। তোর বাবার সাধনা, আদর্শ আমি তোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। এ-ভাবে একটা মূল্যবান জীবন নষ্ট হতে আমি সহজে দেবো না। এটা আমার মা হিসেবে দাবী। তুই ········কতদিন ধরে বিয়ে করবি কথা দিয়েছিস্ অথচ········ (রেগে) একটা বাজে নষ্ট চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খল মেয়ের সঙ্গে বন্ধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছ। পাড়ার লোকেরা কি সব বলছে খেয়াল আছে ? আমারও তো সম্মান আছে। প্রতিষ্ঠিত বাড়ির ছেলে বলে কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে না। কিন্তু অসন্তোষ চাপা আছে। এই ছাই চাপা অসন্তোষ তুমি একদিন দেখবে। নিজের মা, বিপদের আশঙ্কা দেখে তাই সাবধান করছি। যতদূর সম্ভব সরে থাকো। নইলে বিপদ হবে। আর সে বিপদের শিকারে শুধু তুমি নও আমিও বিপদে পড়বো বুঝলে ?

সে রাতে আর কথা হয়নি।

সারাটা দিন ভাঙা প্রেসের মেশিনের শব্দ দু'কান ভরে শুনলাম। কিন্তু বিরক্তি লাগল না। অন্যদিন প্রেসে ঘণ্টাখানেক বসলে প্রাণ আই-ঢাই করে উঠত। ঘুরে বেড়াতাম নানান জায়গায়। এত সহজে কি করে আজকে মনকে বাঁধতে পেরেছি তা বসে অহরহ ভেবেই যাচ্ছি। কাজ-কর্ম নেই। সাহিত্য উঠে গেছে। গান ভুলে গেছি। বক্তৃতা আসরে মাঝে-মধ্যে ডেকে নিয়ে যায়। এ ছাড়া কাজ নেই। আনমনে বসে একটা কাগজ নিয়ে কাটাকুটি করছি এমন সময় একটা চিঠি এল। পড়লাম।

সৌম্যদা,

আজ কেন জানি না, আপনাকে একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে। আজ সারাটা দিন খুব বিশ্রীভাবে কাটবে। পড়াশুনায় মন দিতে পারবো না। সত্যি বলছি সৌম্যদা, আমার এ বাড়িতে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না। যতক্ষণ কলেজে থাকি খুব শান্তিতে থাকি। তাই কলেজ ছুটির পরেও আরও কিছুটা সময় কলেজে কাটিয়ে তবে বাড়ি ফিরি। আজকাল পড়াশুনাতেও বিশেষ মন দিতে পারি না। বই খুলে বসি, চোখ থাকে বইয়ের পাতায় অথচ মন চলে যায় অন্য কোথায়। আমার কেন এরকম হচ্ছে বলুন তো ? কই আগে তো আমার এরকম হতো না। আসল কথা কি জানেন, আমি কি চাই তা নিজেই জানি না। শুধু ভাবি, এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ পাড়া ছেড়ে বহু দূরে চলে যাই।

সৌম্যদা, আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, রাখবেন ? আমার এ চিঠির কথা আপনাকে বার বার মিনতি করছি কাউকে জানাবেন না। আমার খুব ক্ষতি হবে তাহলে। এ চিঠিটা লেখার পেছনে আমার কোনো উদ্দেশ্যে নেই। বিশ্বাস করুন। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে খুব খারাপ লেগেছিল তাই আপনাকে চিঠিতে মনের এত কথা লিখে ফেললাম। মনের কিছুটা ভার হাল্‌কা করে ফেললাম। আর……এত তাড়াতাড়ি আমাকে ভুলে যাবেন না। পুরুষেরা সহজে যা পারে মেয়েরা তা পারে না। একদিন আসুন। শ্রদ্ধা রইল। ইতি—"বন্যা"

চিঠির উত্তর লিখে বেয়ারাকে পাঠালাম।

স্নেহের বন্যা,

তোমার চিঠিটা পড়লাম। গভীর মনোযোগ দিয়ে। প্রাণ দিয়ে। অনেক কিছু বুঝলাম। তোমার ব্যাপারে আরও গভীর-ভাবে চিন্তা করবো। কথা দিচ্ছি। আমি সেদিন রাতে ফিরে এসে সে কথাই ভেবেছিলাম। উপস্থিত সংসারী হবার বাসনা আমার নেই, সত্যই আমার নেই। তাহলে জয়শ্রী ঘোষকে বিদায় দেবো কেন ? তার তো সবই আছে—রূপ, গুণ, যৌবন, অর্থ, লেখাপড়া। অথচ যে আদর্শ নিয়ে আমি তোমার কাছে

গেছি, আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, সে আদর্শ পূরণ করতে হলে আমাকে অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আমি সে ত্যাগ স্বীকার করেছি। করবোও।

আমার একটা অনুরোধ রাখো তুমি। এর জন্য তুমি যা চাইবে আমি নিঃস্বার্থভাবে আত্মত্যাগ করবো। কথা দিচ্ছি। আমাকে এতদিন ধরে তুমি দেখছ—আমি কথার কতখানি মর্য্যাদা দিই—তুমি তা জানো। তুমি শুধু পড়াশুনা কর। তোমার লেখা-পড়া হবে। সাহিত্যের মধুর হাত আছে। দুটো অনুরোধ রাখো। তোমার অনেক ভাল হবে। এটা আমার মনের কথা, প্রাণের কথা। সময় করে কাল-পরশু যাচ্ছি। সন্ধ্যায় থেকো। পডাতে যেয়ো না।

শুভেচ্ছাসহ—সৌম্যদা

বসন্ত এসে মনের দ্বারে কখন নাড়া দিয়ে গেছে জানি না। তবে মনে প্রাণে যে নতুন কিছু অনুভব করছি তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। চণ্ডীদাসকে মনে পড়ল : আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া। চণ্ডীদাসের সেই রজকিনী প্রেমের কথা ভাবলাম। মনে পড়ল শরৎচন্দ্রের গোপন প্রণয়ের কথা। আমার মতো এক উদ্‌ভ্রান্ত ছন্নছাড়া মানুষের প্রয়োজন কারো থাকতে পারে তা ভাবতে পারলাম না। 'নরেন' বোধ হয় আমার পথেরই পথিক। তাই বিজয়া তাকে ছাড়তে পারে নি। সে ঠিক শেষ লগ্নে ঘেরাও করে তার উদ্দেশ্য সফল করে নিয়েছে। কিন্তু আমি তো এক্ষেত্রে নাচার। মায়ের খুব আঁচল-ধরা বাধ্য ছেলে। মত না নিয়ে বাড়ি থেকে বাইরে যাই না। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে বসে এত সব ভাবছি। একটা ছেলে এসে জানায় বন্যাদি এই চিঠিটা দিয়েছে :

সৌম্যদা,

আপনার চিঠি পড়লাম। একবার নয়। বার বার। অসংখ্যবার। খুব ভাল লাগলো আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন বলে কথা দিয়েছেন বলে। পড়াশুনা আমি সত্যই ভালবাসি

সৌম্যদা। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ বলে একটা জিনিষ আছে তো? সেখানে স্থায়িত্ব না এলে মনের দুয়ারটা তালা দিয়ে আটকাতে পারছি না। কেবলই যেন সাহস হারিয়ে ফেলছি। এই সব নানা চিন্তা মাথায় ঢোকাতে পড়াশুনার কিছুটা ক্ষতি হচ্ছে স্বীকার করছি। তবে আমি সে সব চিন্তাকে দূরে সরিয়ে পড়াশুনায় মন দিতে যথেষ্ট চেষ্টা করি। আমি আপনার অনুরোধ রাখবোই সৌম্যদা। পড়াশুনার দিকে আমি এবার বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবো। এ কথা তো আপনাকে আমি আমার প্রথম চিঠিতে জানিয়েছিলাম। আজ আবার জানালাম। শ্রদ্ধা নেবেন।

আপনার প্রাণের প্রিয়

"বন্যা"

পর পর চিঠিগুলো পড়ে এক বিরাট সমস্যায় পড়লাম। অনেক কিছু ভাবলাম। তাহলে ওকেই জীবনের সঙ্গী করতে হবে। কিন্তু মাকে না হয় বোঝানো গেল। প্রলয়দা কি এত সহজে আমার এই মহৎ উদ্দেশ্যকে মেনে নেবে? তাছাড়া শুনেছি ওরই ভালবাসার ছত্রচ্ছায়ায় ছেলেটা এত বড় হতে পেরেছে। নইলে ও আজ সমাজে যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা কোনোদিন পেতো না। অন্য-দিকে বন্যা জানে, ওকে নিয়ে ও জীবনে কিছু পাবে না। মেয়েরা সংসার-জীবনে ভীষণ স্বার্থপর। সেখানে প্রেম ভালবাসার উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠাকে চায়। কিন্তু আমার তরুণ-কোমল মন মেয়েদের এই স্বার্থপর মনোবৃত্তিকে সমর্থন করবে কি করে? তাছাড়া ওদের পূর্বের সমস্ত ঘটনা না জেনে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা উচিত কিনা, তাও ভেবে দেখা বিশেষ দরকার। চিঠিতে এত কথা বললেও বন্যা কিন্তু তার পূর্ব ইতিহাস আজও জানায় নি। বন্যা বেশ ভাল করেই জানে ওর কলেজ-জীবনে যতটুকু পড়াশুনা হয়েছে তা সবই আমার শুভ প্রচেষ্টায়। এবং এর পরেও যা হবে তা সম্পূর্ণ আমার উৎসাহ ও আগ্রহের জন্যে। নারী চরিত্র এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। ওদের মন-জানা আর চেনা জগতের সবচেয়ে পরিশ্রমলব্ধ গবেষণার বিষয়। একটা মেয়েকে জানবার জন্যে যে চিন্তা ও উৎকণ্ঠা থাকে

সেই আগ্রহ আর নিষ্ঠা অন্য কাজে দেখালে যে কোনো ছেলে উচ্চ গবেষণায় বৃত্তি পেতে পারে। সেই সব উৎসাহগুলোকে যদি অন্য কাজে লাগানো যায় সমাজের অনেক মঙ্গল আর উপকার হয়। এ যুগে আদর্শ প্রেম বলে কিছু আছে বলে মনে হয় না। যা হোক বন্যার সম্পর্কে আরও তথ্য জানা প্রয়োজন। মনে পড়ে রবীনের কথা। সেও বীথিকে খুব ভালবাসত। সেই তার জীবনের প্রথম প্রেম। প্রচুর খরচ করে শেষে দেখল মেয়েটা এতদিন ধরে তার সঙ্গে অভিনয় করেছে। আজ রথীনের কথা মনে পড়ে। ছেলেটার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কেমন করে জ্বলে নষ্ট হয়ে গেল সে কথা ভাবলে আমার গা শিউরে উঠে। এসব কথা ভেবে এত দূরে সরে আছি। অথচ আবার আমাকেই না সেই বিপদের পথে পা দিতে হয়। রবীন এসে আমার সদর ঘরের কোচে বসে দুঃখ করে যে সব কথা সে রাতে বলেছিল তা আমি আজও ভুলতে পারছি না। তার কথা মতোই আমি বন্যার কাছে কোনো ডকুমেণ্ট রাখতে চাইনি। পাছে ফাঁস করে গলায় ফাঁস না পরিয়ে শেষে গিলোটিনে পুরে দেয়। এ ক্ষেত্রে wait and mark policyই b est. পড়াশুনা করুক এম. এ-টা পাশ করলে তারপর না হয় অন্য চিন্তা করবো। এর মাঝে পাখি খাঁচা থেকে উড়ে গেলেই বাঁচি!

পরের দিন সকালে প্রেসের কাজকর্ম দেখছি। সামনের জানালা খুলতেই এক ঝলক সোনা মুখ রোদ এসে স্বাগত জানাল। প্রকৃতির দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলাম। ভীষণ মধুর লাগল। খুশিভরা রোদ যেন উন্মুখ হয়ে কিছু বলার জন্যে সে সকালে প্রতীক্ষা করে বসেছিল। খুব ভাল লাগল। ভাল দুটো পার্টিও পেলাম। বন্যার কথাই ছিল আমার ধ্যান-জ্ঞান। দিনের প্রায় অধিকাংশ সময় ওকে নিয়েই মেতে আছি। একটা মেয়ে এতখানি মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু ওকে গ্রহণও করতে পারছি না আবার উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে বর্জনও করতে পারছি না। এ এক ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। এই ডিলেমা থেকে আমাকে তো বাঁচতে

হবে। চোখ বুজিয়ে গভীরভাবে ভাবছি। এমন সময় নাপ্‌তে পাড়ার বাচ্ছাটা এসে হাজির। সৌম্যদার চিঠি :

প্রাণপ্রিয় সৌম্যদা,

এক এক সময় মনে হয় আপনাকে অনেক কথা বলার আছে। কিন্তু কেন জানি না সে সব কথা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না—লেখনীর সাহায্যেও নয়, মৌখিক ভাবেও নয়। হয়ত এটা আমার ভাষাগত অক্ষমতা। আজ এ চিঠি লেখার আগে পর্যন্ত অনেক কথাই লিখব বলে ভেবেছিলুম কিন্তু আর কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছি না, এখন।

আপনি তো হিন্দী ছবি দেখেন না। এতো আপনার আদর্শের বাইরে। আমার অবস্থা এক কথায় 'লাটসাহেব' বইয়ের মতো। মেয়েরা সব মনের কথা কোনোদিন কাউকে খুলে বলে না। আপনি বাস্তব জগৎ সম্পর্কে এতখানি অজ্ঞ, জানতাম না। ভাবে, আকারে, ইঙ্গিতে মনের আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে আমরা অভ্যস্ত। অথচ আমরা যা বলতে চাই তা না বুঝলে আমাদের মনে অত্যন্ত ক্ষোভ দেখা যায়। আপনাকে এত করে বোঝাচ্ছি সৌম্যদা, আপনি এ সব কথা বুঝছেন না কেন? দেখছি আমাকে নিয়ে আপনার মনেও শঙ্কা আর সংশয় রয়েছে। আমার ভাগ্য যে কোন্ পথে যাবে তা আমি আজও ভাবতে পারি না। হয় বস্তিবাড়ির পচা আবহাওয়ার মধ্যে আমাকে তিলে তিলে মরতে হবে; তা না হলে রাজরানী হয়ে সুখে দিন কাটাতে হবে। আমার হাত দেখে আপনি যে সব কথা বলেছেন সে সব কথা ভেবে ভয়ে আঁতকে উঠি। অথচ আমি কতো না সম্ভাবনা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছি। সংগ্রাম করে বড় হয়েছি। তবু আমার ভাগ্য এমনভাবে লেখা হবে কেন? আপনি তো আমাকে 'অপরিচিতের' শুনীতা বলে মাঝে মাঝে উপহাসও করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো দিন আমি বাঘ-কুমিরের লড়াই দেখতে চাইনি সৌম্যদা। আপনার সঙ্গে প্রলয়দার

তুলনা কোনোদিন আমি করতে চাইনি। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি তো জ্যোতিষ পড়াশুনা করেছেন। আমার জীবনের শেষ অধ্যায় কি সত্যই করুণ? মর্মান্তিক? আপনার লেখা ছোট গল্পটা পড়ে গত রাতে শিউরে উঠেছিলাম। মনে হল আমি যেন সুপর্ণা রায়ের রোলে প্লে করে যাচ্ছি। গল্পটা কি সত্যই আমায় ভেবে লিখেছিলেন? সাহিত্যিকরা বাস্তবের প্রতিচ্ছবিকে অবলম্বন করে তাতে কল্পনা মিশিয়ে তাদের মনের প্রতিমা গড়ে তোলে। আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে সৌম্যদা এই সব কথা। ক'দিন ভীষণভাবে চিন্তা করছি। ক্লাসও করছি না। পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছি। হয় আপনি আসুন, নইলে কিছু লিখে পাঠান। দিন দিন আপনি আমার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছেন। অথচ আমার মনের সব কথাই আপনাকে খুলে বলেছি। চিঠিতেও প্রকাশ করেছি। ভাবছি হয়ত শেষে আত্মহত্যা করতে না হয়। এটাই বোধ হয় আমার জীবনের চরম পরিণতি। আপনি হাত দেখে বলেছেন আমি ভ্রষ্টা হবো। তার আগে সম্মানের তাগিদে আত্মহত্যাই আমার শ্রেষ্ঠতম পথ বলে মনে করি। আমার শিক্ষার কি মূল্য আছে আজও তা বুঝতে পারছি না। কত ছেলের সঙ্গে গভীরভাবে বন্ধুত্ব করেছি, কত মন কেনাবেচা করেছি, বলতে কুণ্ঠা নেই আমার দেহ নিয়ে তৃপ্তি পেতে চেয়েছে সবাই। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম আপনি। দেখলাম আপনি পবিত্র মনের পূজারী। পড়াতে এসে মাস তিনেক আপনি আমার মুখের দিকে কোনোদিন তাকান নি। এ নিয়ে আমরা কত ঠাট্টা-তামাসা করেছি। তারপর আপনি আমাদের বাড়ির একজন হয়ে গেছেন। আপনার ওপরে আমার মায়ের কি গভীর অপত্যস্নেহ তা হয়ত সবটা আপনি জানেন না। আমাদের চেয়ে বেশি ভালবাসা পেয়েছেন। মায়ের অসুখের সময় আপনিও তার যোগ্য কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। এমন একটা দিনও যায় নি যে দিন আপনাকে নিয়ে আমরা আলোচনায় বসিনি। আজ আমি মনের কি অবস্থায় আছি তা আপনার খেয়ালী মন বুঝতে

পারছে না। আপনি আজ-ই সন্ধ্যায় আসবেন। মা আপনার জন্যে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। একটু বেলা থাকতে আসবেন। দিন-কাল ভাল নয়। বাড়ি ফিরতে দেরি হলে আপনার মা আবার রাগারাগি করবেন। হোটেল বাড়িতে থাকা বন্ধ হয়ে যাবে।

শ্রদ্ধা নেবেন

আপনার "বন্যা"

চিঠিটা মন দিয়ে বেশ কয়েকবার পড়লাম। বার বার 'লাটসাহেব' কথাটা মনে এসে বাজতে লাগল। বইটার ঘটনা জানার প্রয়োজন বোধ করলাম। প্রেসের নবকুমারকে ডেকে পাঠালাম।

আচ্ছা, এ বছরের সব চেয়ে ভাল হিন্দী বই শুনলুম 'লাট-সাহেব' হয়েছে। এটা কি ঠিক? দেখ না, আমার এক বন্ধু এ নিয়ে রীতিমতো তর্ক সুরু করেছে। আমি বললুম: ওসব হিন্দী-বাংলা বুঝি না, আমার এক কর্মচারী ভাই আছে সে আসুক তোমার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে।

'দূর, দূর' বিরক্ত হয়; সৌম্যদা ওটা কি একটা বই হয়েছে? বাহার, নাগিন, সংগম, আরজু, আরাধনা—এ সব বইয়ের দাম কেউ দিতে পেরেছে? ও সব বই রকবাজদের ভাল লাগতে পারে।

আচ্ছা শোন, দু'ঘন্টা তোকে কম্পোজ করতে হবে না। তুই গল্পটা বল। আমি কিছু বলবো না। আরে বাবা, তোর মালিক বলছে। শুনবি না।

মালিক বলুক আর চাকর বলুক কাজের সময়ে আমি অন্য কিছু করতে পারবো না। সব জিনিষের একটা সময় আছে। নিয়ম মেনে চলবেন না? অহেতুক রাগ করবেন না। পরে বলবো। কথা দিচ্ছি। কি রাগ করলেন? বিনয়ের সুরে বলে: বলছি ভাল বই নয়। একটা লম্পট কি করে কয়েকটা মেয়ের সর্বনাশ করেছে তার একটা সুন্দর ছবি আছে। হল তো। এবার

আপনার মাকে যদি এসব কথা বলি ? দু'ঘণ্টা কাজও করতে হতো না আর ফাঁকি দিয়েও বেড়াতে পারতাম। কালকে যাত্রীসংঘের সুভেনিয়ারটা দেবেন কি করে ? খেয়াল আছে। চল্লিশ পাতার বই। সবে ধরেছি। আজকাল আপনি দেখছি বড় বেশি উদাসীন হয়ে গেছেন। ও সব বাজে ঝামেলা ছেড়ে দিন তো। অনেক মনে শান্তি পাবেন। পাঁক থেকে তাকে তুলেছেন বলেই তার গায়ে পাঁকের গন্ধ থাকবে না ! পেকাল মাছকে কি ভাল জলে রাখতে পারবেন ? সে পাঁকই খুঁজবে। আমি আবার মালিক-ফালিক মানি না। টাকা নেবো কাজ করবো।

হেসে বললাম: খুব কথা শিখেছিস্ দেখছি। এবার বোনাস্ দেবো না।

—বলি কেন, সুখে খেতে ভূতে কিলোবে ? বেশ তো ছিলেন। আর কি ছাত্রী পেলেন না। ওদের চিনতে আমার বাকী আছে ? আর যাবেন না। আর কখনও যদি যান সব কথা মাকে খুলে বলে দেবো। বুঝলেন। ওমা, এরই মধ্যে গভীর কল্পনার সাগরে ডুবে গেছেন। মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করাই দায়। দেখছি বন্যাদির স্বপ্নে বিভোর ! যাক্ মালিক যাচ্ছে যাক্। টাকা আছে ওড়াচ্ছে। যখন টাকায় টান পড়বে বুঝবে। ওরা সম্মান নিয়েও জুয়োখেলায় অভ্যস্ত। ঐ মেয়েটার হাতেই সৌমেনদা শেষ হবে। তবু সৌমেনদা কেন বুঝি না জেনে-শুনে বিষ পান করতে গেলেন। বন্যাদির চোখে স্পষ্ট দেখছি সৌমেনদার সর্বনাশ।

—কিরে কিছু বলবি ?

—না, কালকে যাত্রীসংঘের বইটা দিতে হবে। তা আমি একা কি করে সবটা কম্পোজ করবো। আর একজনকে পার্ট টাইম নিলে ভাল করতেন। নইলে কাল function বিকেলে কি করে দেবেন বলুন। অর্ডার নিয়ে তো বেশ বসে আছেন। বিকেলে আপনি তো থাকেন না। তারা এলে কি বলবে ? কথা গুলো বোধ হয় কানে গেলো না ? যা পারেন করুন, আমি আর পারি না। কবে ছেড়ে দেবো তাই ভাবছি।

—যা পারিস কর। না হয় এ কাজটার জন্যে আমাকে টাকা দিতে হবে না। বুঝলি ? তাহলে হবে তো ? তুই-ই প্রেসের আসল মালিক রে। আমায় সামান্য কিছু দিয়ে যা পাবি তোরা দু'জনে ভাগ করে নে। এখনও বুঝতে পারছিস্ না, কখন আছি, কখন নেই। নানান কারণে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। নিজের উপরে সমস্ত আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। সেজন্য আমি না থাকলেও মাকে তোরা দেখবি, নিজের মা ভেবে।

প্রেসের সব সমস্যা মিটে গেলে স্থির করলাম আজ রাতে যাওয়া দরকার। সেই সঙ্গে প্রলয়ের পূর্ব সম্পর্কটাও আজ কিছুটা জেনে তারপর ওকে একটা ফাইনাল ডিসিসন দেবো। সব স্থির করে পড়ানোর নাম করে মার অনুমতি নিয়ে যাত্রা করলাম। পথে বেরিয়েছি এক বন্ধু অনুরোধ করে : চল, সিনেমায় advance কাটানো আছে। এলিটে। ভীষণ ভাল বই। ইমপিরিয়াল ভেনাস্।

—অসুবিধে আছে। পারলাম না। সরি। দু'জন ছাত্র এসে মাতৃভাষার মাধ্যমে চিকিৎসা বিদ্যার সুবিধা-অসুবিধার ওপরে একটা রচনার কয়েকটা পয়েন্ট লিখে দেবার জন্যে অনুরোধ করে—পরে আসার কথা বললাম।

হঠাৎ আকাশে ঘন-ঘটা। মেঘের গুরু-গুরু গর্জন। তীর-বেঁধা বৃষ্টিও সুরু হল। বাধা পেয়ে ফিরে আসে সৌমেন্দু, ছাতা চাই। মা বলেন : এই দুর্যোগে ভর সন্ধ্যেবেলায় আজ আর যাস না। চারদিকে খুন, জখম, লুটপাট চলছে। আর যদি একেবারে যাওয়াই ঠিক করে থাকিস্ তাহলে ঘড়ি-আংটি-টাকা আমার কাছে রেখে যা। আর খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি। তুই এলে খাওয়া-দাওয়া করবো। বুঝলি ?

—বেরিয়ে গেলাম। গলিটা সূচীভেদ্য অন্ধকারে ঢাকা। অমাবস্যায় বোধ হয় এতখানি অন্ধকারের গাঢ়তা দেখা যায় না। পথ-ঘাট বাড়ি কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জানি না, শরৎচন্দ্র এই

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কি করে আঁধারের রূপ খুঁজে পেয়েছিলেন? কবি মন তাঁর জাগ্রত ছিল বলেই এতখানি অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে। শরৎচন্দ্রের কথা ভাবতে ভাবতে বন্যাদের বাড়ি পৌঁছে গেলাম। দেখি, যেন শ্মশানপুরীতে তিনজন একসঙ্গে বসে নানান সাংসারিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা সুরু করেছে। আমাকে দেখে বন্যা বলে উঠল: ও! আপনার কথাই এতক্ষণ ধরে হচ্ছিল। মা, তোমার বড় ছেলে অনেক কাল পরে এসেছে গো, কি আছে দাও। নইলে আমাদের সঙ্গে আবার ঝগড়া সুরু করতে পারে। অনেক দিন পরে যাক্ আজ আবার ঝগড়া করার একজন মানুষকে পেয়েছি। ভাই আজ কি বলছিলি?

আমি বলি: বি সিরিয়াস মাই ফ্রেণ্ড! ডেকেছ কি জন্যে বলো। আমার কি কাজ-কর্ম নেই যে তোমার কাছে এসে বসে থাকবো। কি জানেন, কাকীমা, আর এখানে আসতে একেবারে ভাল লাগে না। একটু চেঞ্জের বিশেষ প্রয়োজন। আমি সংগীত ভালবাসি। সৎ ও নিষ্ঠা পরায়ণ একজন সঙ্গীর খোঁজ করেছি। বহুদিন ধরে করেছি। পাই নি। আপনি বলেছিলেন ও এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। কিন্তু ওর সঙ্গে মিশে দেখলাম ও ফ্র্যাঙ্ক নয়। আজ পর্যন্ত ও কিছু কথাই জানায় নি। অথচ আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে কত অনুরোধ করে রোজই লোক পাঠাচ্ছে। শুনি পাড়ার ছেলেদের সঙ্গেও ওর বন্ধুত্ব আছে। তাদের সঙ্গেও ওকে দেখা যায় পথে-ঘাটে। আমি এটাকে খুব ভাল চোখে দেখি না। আমার ভালও লাগে না। এই প্রেমের অভিনয় আর ভালবাসার বেসাতিকে আমি দারুণ ঘৃণা করি। ওর সঙ্গে প্রলয়দারও সত্যি-কারের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, আমার মনে হয় ওদের বিয়ে হওয়া উচিত। আমি মুক্তিবাবুকেও এই কথা একদিন বলেছিলুম। উনি সরাসরি এ কথার সত্যতা অস্বীকার করেছেন। আপনার কাছ থেকে এ কথার সত্যতা জানতে চাই। বন্যাকেও অনেক বলেছি ও গোপন কথা কিছু বলতে নারাজ। আমি অবশ্য এর

গোপন রহস্য কিছুদিন আগে জেনেছি। সেজন্যই এর সত্যতা বিচার করে দেখতে চাই। আপনাকে এর আগে বলেছি। আপনি বলেছেন যে এটা চাপল্যের ঘোর। বছর দু'য়েকের মধ্যে এই ঘোর কেটে যাবে। তখন ও নিজের ব্যাপারে সচেতন হবে। অন্যদিকে আপনারা আবার ওকে যথেষ্ট সুযোগ দিচ্ছেন। ঐ বাঁদর-ভাইটা দিদির চিঠি বয়ে বেড়াচ্ছে। স্পায়িং করছে। আপনাদেরও দেখছি যথেষ্ট দুর্বলতা আছে। আমি কিন্তু এই দোলায়মান অবস্থায় থাকতে চাই না। তাই আমার সঙ্গেই যদি ওর পবিত্র বন্ধুত্বের সম্পর্ক ও রাখতে মনস্থ করে থাকে তাহলে আজই ও অতীতের সব কথা খুলে বলুক। আমি সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করবো না। এসব কথা শুনলে আমার মনের সংশয় দূর হবে। আমি নিরপেক্ষভাবে ওকে বিচার করতে পারবো। একটা অজ্ঞতার মধ্যে থেকে ভুল বোঝাবুঝির মাঝে থাকতে আমি নারাজ। কিছু মনে করবেন না। ওকে অনেক দিন বলেছি। অন্য কথায় জাল বুনে আমাকে ও প্রতারিত করার চেষ্টা করছে। এটাকে আমি ঘৃণা করি। মানুষের মনের আর মুখের ভাষা হবে এক। সরলতাই মানুষকে মানুষ করে তোলে। আজ আপনি যা বলবেন তার ওপরে একটা সিদ্ধান্ত নেবো।

কাকীমা বলেন : এত উত্তেজিত হয়ো না সৌমেন্দু। ও সব বাজে কথা। বাড়িতে বড় মেয়ে থাকলে অনেকে অনেক বাজে কথা বলে। তুমি এত আদর্শ পরায়ণ ছেলে। তোমার সম্পর্কেও অনেক বাজে কথা শুনেছি। তাতে কি এলো-গেলো। খাঁটী সোনাকে ভাল করে না চিনতে পারলে ভেজাল বলে মনে হতে পারে। বাজে কথায় কান দিও না। নিজের সাধনা কর। বড় হবে। তারপর তোমরা যদি জীবনে এক পথ চাও আমার আপত্তি নেই। আজ এই পর্য্যন্ত থাক। খাও। তুমি দুর্বল। চিন্তিত। কফিটা সবটা খেয়ে নাও।

—এই একটু আগে ঠাকুরের প্রসাদ বলে কি সব খাওয়ালেন। তারপর চা-বিস্কুট। তারপর আবার লুচি-তরকারী। কত খাবো?

কাকীমা বলেন : আসল কথা কি জানো, আমার মেয়েটা ভীষণ বোকা। ও জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারে না। এটাই ওর সব চেয়ে বড় দোষ। পাগলের মতো গাদা খানেক চিঠি লেখে। ওর যাকে সাময়িক ভাল লাগে তাকে হাতে রাখবার জন্যে আমাদের নামেও যা তা করে, আত্মসম্মানে ঘা দিয়েও চিঠি দেয়। তোমার কাছেও তো এই ধরনের চিঠি আছে। প্রলয় তো হুমকি দিয়ে গেছে। ওর কাছে যে সব চিঠি আছে তা দিয়ে নাকি ওর বিয়ে ভেঙে দেবে। শুনেছি হামলা করে ওকে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যাবে। বাড়িতে পোষ্টার মারবে। আরো কত কথা। তা বাবা, বিধবার মেয়েকে জোর করে বার করে নিয়ে যাওয়া এই দিনে কি একটা সমস্যা ? সেই জন্যেই তো তোমাকে বলছি, বাবা মাথা ঠাণ্ডা করে বসে আমার সঙ্গে যুক্তি করে কিছু গঠনমূলক কাজ করা প্রয়োজন। এ বাড়ি বিক্রি করে আমাকে যেতেই হবে। আজ তুমি তো আমার একমাত্র সহায়. সম্বল। তোমাকে ছেড়ে দিলে অনাথ বিধবার আশ্রয়ে আর কে থাকবে বল ? এত অল্পে উত্তেজিত না হয়ে আজ চিন্তা কর, তারপর কাল একবার এসো। কথা রাখলে খুব ভরসা পাবো।

—রাত বাড়ল। ফিরলাম। কিছুটা এসেছি। মনে হল আমার পেছনে কারা যেন কথা বলতে বলতে আসছে। গভীর চিন্তায় অন্যদিকে কান দেবার মতো মানসিকতা ছিল না। অন্ধকারে ঠিক মুখ দেখা যাচ্ছে না। অথচ আমার সম্পর্কে ওরা অনেক কথা বলে যাচ্ছে অনর্গলভাবে। ক্রমে ওদের কথাবার্তা খুব কাছাকাছি মনে হলো। আমি তখনও ঠিক চিনতে পারিনি। গলি থেকে বেরোতেই আমার হাত দুটো হঠাৎ ধরে ফেলে একজন ; অন্যজন একটা ছুরি নিয়ে বুকের কাছে ধরে বলে : অযথা কেন চেষ্টা করছিস্। কাল থেকে আর আসবি না। এলে এই ছুরিতে তোর প্রাণ যাবে। বলে দিচ্ছি। আমাদের যা বক্তব্য তা পরে তোকে জানাবো। মাঝে তুই যদি আসবার চেষ্টা করিস্ বিপদে পড়বি। আর এ সব কথা আউট হলে আরও বিপদ—বলে ওরা চলে গেল।

—বাড়ি ফিরে এলাম। সারাটা রাত ঐ লাটসাহেবের গল্প নিয়ে তলিয়ে দেখলাম! এক্ষেত্রে আর যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে করি না। ভাবলাম এতদিনে সমস্যাদীর্ণ একটা উচ্ছৃঙ্খল মেয়েকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করতে যাওয়া নিছক বোকামি ছাড়া আর কিছুই হয় নি। রাতটা কাটল। প্রেসের কাজে ডুবে আছি। যাত্রী সংঘের বই আজ দিতে হবে। হঠাৎ দুপুরে একটা রেজিস্ট্রি-করা চিঠি পেলাম :

সৌমেন্দুবাবু, এ গলিতে এলে আপনার আর জীবনের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম। আজ আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি। বাড়াবাড়ি করলে সরাসরি আপনাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবো। আগুন নিয়ে খেলা আর করবেন না। আমাদের সম্পর্কের ইতিহাসটা হয়ত আপনি জানেন না। প্রথম জীবনে যে স্মৃতিকে আমি ভালবাসতাম, যার জন্যে আমি আমার জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করেছি, সেই স্মৃতি আজও আমার কাছে স্মৃতি হয়ে আছে। মেয়েরা এতখানি বিশ্বাসঘাতক, সৌমেন্দু-বাবু, এ আপনি ভাবতে পারবেন না। আমার সঙ্গে কতদিন ঘুরেছে, বেড়িয়েছে, আমি টাকার শ্রাদ্ধ করেছি, অথচ আমাকে শেষে মামারবাড়ি যাবার নাম করে অন্য ছেলেকে বিয়ে করে চলে গেল ভাগলপুরে। তারপর আমি মেয়েদের সম্পর্কে ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠি। কাউকে আর ভাল চোখে দেখতে পারলাম না। আমার জীবনে আরও অনেকে এসেছে। কিন্তু প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার সময়ে আমি যে মানসিক বেদনা, যে তীব্র গ্লানি অনুভব করেছি তাতে আমার আত্মহত্যাই একমাত্র পথ ছিল। সেই আত্মহত্যার পথ থেকে বন্যা আমাকে বাঁচিয়েছে। তার স্নেহ ভালবাসার ছত্র ছায়ায় আমি আবার নতুন করে জীবন সুরু করেছি ; ওরই প্রেরণায় পাশ করেছি এবং বহু চেষ্টার পর আমি সরকারী চাকুরী পাই। আমাকে কয়েক বছর সময় দিয়েছে। এর মধ্যে আমাকে গ্রাজুয়েট হতে হবে এবং চাকুরীতে উন্নতি

করতে হবে। এই সেদিনও ও আমার কাছ থেকে আপনার প্রশ্নের উত্তর জেনে গেছে। দু'নৌকায় পা দেওয়ার প্রশ্নে ও প্রত্যক্ষভাবে আমার নৌকাতে থাকবে বলে সম্মতি জানিয়েছে। অথচ ও জানে আপনাকে ছাড়া ওর জীবনে প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সে জন্যে ও আপনাকে ছাড়তে পারছে না। তাছাড়া আমার চেয়ে আপনি প্রতিষ্ঠিত বাড়ির ছেলে, শিক্ষা-দীক্ষায় ও বংশ মর্যাদায় অনেকখানি উচ্চ বলে ও আপনাকেও পেতে চায়। অথচ ওর ওপরে আমার অনেকখানি দাবী আছে। এ কথা শুনলে হয়ত আর ওর ওপরে আপনার আসক্তি থাকবে না। ওর সঙ্গে আমার সাংসারিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। তার বহু ছবি আমি রেখে দিয়েছি। বহু চিঠি আছে। অন্যত্র যেখানে ওর সম্বন্ধ হবে আমি এগুলো সেখানে দেখিয়ে দেবো। ফলে বিয়ে হবে না। এসব জানার পর আশা করি আপনি এ পথে আর আসবেন না, অগ্রসর হবেন না। আপনাকে সম্মান করি, সেজন্যে অনুরোধ করি, ছোট ভাইয়ের নির্বাচিতাকে কেড়ে নেবেন না। তাহলে ডেস্‌প্যারেট হতে বাধ্য হবো। ....

চিঠিটা পড়লাম। অনেক বার। একটা কথা বার বার মনে হলো সত্যই লাটসাহেবের ঘটনা আবার ঘটলো। এইভাবে অসমাজিক শয়তানটা অনেক মেয়ের সর্বনাশ করে যাবে? কিন্তু ভাবতে বিস্ময় লাগছে ও-গল্পের শেষাংশের যে করুণ কাহিনী আর উপযুক্ত শিক্ষা সে পেয়েছে তার ঘটনা কি করে ভুলে যাচ্ছে! ঐ হাবা মেয়েটা তাকে কি রকম আঘাত হেনেছে সে কথায় ও কি করে ভুলে যাচ্ছে, তাই ভাবি। চিঠিটার নিচে কারো নাম নেই। আটটা ডট রয়েছে। মনে হলো আট অক্ষরের পুরো নাম। চিঠিটা পড়ে শেষে গভীর তৃপ্তি পেলাম। এক ঝলক মিঠে হাওয়া জানালা দিয়ে এলো। যাক্ অনেক, অনেক সমস্যা সমাধান হলো আজ। মনের মধ্যে যা নিয়ে গত একটা বছর তীব্র দ্বন্দ্ব সংঘাতে ভুগছিলাম তার সমাধান হলো। আর যাবো না। মেয়েরা এরকম নিমকহারাম জাত তা রাসবিহারীর কোচে দেখেছিলাম।

এখন বাস্তবে তা দেখতে পাচ্ছি। এমন স্বার্থপরতা দেখা যায় না। ছেলেটা বাস্তবের চরম শিক্ষা পেয়েই এতখানি ডেস্‌প্যারেট হয়ে গেছে। পরিবেশই ওকে বাধ্য করেছে। স্মৃতির সঙ্গে ওর প্রথম জীবনের প্রণয় সার্থক হলে ছেলেটা আজ হয়ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো। মানুষের জীবনটাই একটা প্রবাহ। কখন কোন স্রোত এসে কোথায় টেনে নিয়ে যায় কে জানে।

আর গেলাম না বেশ ক'দিন। অনুরোধ এলো, কাজের অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করলাম। বার বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সৌমেন্দুর ওপরে বন্যার অত্যধিক অভিমান দেখা গেল। সৌমেন্দুকে দেখাবার জন্যে প্রেসের পাস দিয়ে বন্যা প্রলয়কে নিয়ে যাতায়াত সুরু করে দিল। ক্ষুব্ধ সৌমেন্দু বন্যার সঙ্গে তার এই সব সম্পর্কের কথাগুলো বন্যারই এক আগের বয়ফ্রেণ্ডের কাছে বলে। কথাচ্ছলে এই সব কথা বন্যার কানে যায়। বন্যা একে অসন্তুষ্ট ছিল তার ওপরে এইসব কথায় ভীষণ চটে যায়। সৌমেন্দুর ছেলে মানুষীর সুযোগে প্রলয় তার পূর্বের পজিশানটা বেশ গুছিয়ে নেয়। খেয়ালী সৌমেন্দুকে বিকৃতভাবে বন্যার মনের কাছে হাজির করে। বন্যা সৌমেন্দুর উপরে চিরদিনের মতো বিচ্ছেদের পরদা টেনে দেবার জন্যে আক্রমণ করে পত্র দেয়। সাময়িক একটা বিচ্ছেদ হয়। সৌমেন্দু সম্পূর্ণ সরে থাকে। চিঠিটা হাতে নিয়ে বার বার ভাবলাম : এত তাড়াতাড়ি মেয়েদের মত পরিবর্তন হয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিন্ন বোঝা যায় না। এই সেদিনও আমাকে কাছে পাওয়ার জন্যে কতবার অনুনয়-বিনয়-মিনতি ·· ········আর আজ আমাকে ওর সবচেয়ে বড় শত্রু ভেবে আমাকে জব্দ করে অপমান করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। কি পাগল! হায়রে জগৎ! চিঠিটা যে একটা সাময়িক মুহূর্তের উচ্ছ্বাস বা আবেগ তা পড়ে বেশ ভাল করে বুঝলাম :

সোমেনদা,

আবার কোনোদিন আপনাকে চিঠি লিখতে হবে ভাবিনি। কিন্তু তবু লিখতে হলো। ঘটনাচক্রেই সব কিছুকে বদলে দিলো।

তবে সত্যি কথা বলতে কি জানেন, আজকাল কাউকে বিশ্বাস করে চিঠি লিখতে আমি ভয় পাই। ভীষণ জানতে ইচ্ছা করছে আমি কি আপনার কোনোদিন কোনো ক্ষতি করেছিলাম। না হলে আপনি এভাবে দিনের পর দিন আমার পেছনে লেগে রয়েছেন কেন? আমি যাদের সাথে মিশি তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমার সম্বন্ধে আলোচনা করছেন কেন? আমার মানসিক সুখ শান্তিই বা নষ্ট করছেন কেন? এটা কি ঠিক নয় যে পড়াশুনার জন্যে যথেষ্ট মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। আপনি তো আমার মাথায় নানা চিন্তা ঢুকিয়ে আমার mental disturbance ঘটাচ্ছেন; আপনার এ ব্যবহার দেখে আপনার কাছে আমার তাই জিজ্ঞাস্য আমি আপনার কোনো স্বার্থে আঘাত দিয়েছি, যার ফলে আপনার এই ধরনের ব্যবহার!

আপনি আমার ভালোর জন্যই নাকি এসব করছেন। আপনার এই ইচ্ছার উত্তর হিসেবে জানাচ্ছি যে আপনাকে আমার ভালমন্দ বিচার করতে হবে না। সেজন্য আমার মা এখনও জীবিত রয়েছেন। আপনি আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন-এটা আমার মা চান না। আপনি বলে এসেছেন ছেলেদের সাথে প্রেমের অভিনয় করে বেড়ানোই আমার পেশা।

আপনাকে আমি যে সব চিঠি দিয়েছি সে সব চিঠি অতি অবশ্যই ফেরৎ দেবেন। আর আপনি যদি আমার ঐসব চিঠি ফেরৎ না দেন এবং ভেবে থাকেন এগুলো কাছে রেখে ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করবেন, ভুল করবেন খুব তাহলে। সুতরাং আমার ভালমন্দ আমার মা-ই আপনার চেয়ে বেশি বোঝেন। আপনাকে এ নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে না। আপনি বাইরের লোক, বাইরের লোকের মতই থাকবেন। কি সম্পর্ক আপনার সাথে আমাদের। আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মাথা গলাবার চেষ্টা করবেন না। এটাই আমাদের বাড়ির মা'র এবং আমার ইচ্ছা। কারণ আপনার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ আমাদের কাছে সবই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমার

পড়ার ব্যাপারেও আপনার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। চিঠিতে সব কথা লেখা হ'লো না। একদিন যদি আমাদের বাড়িতে আসতেন ভাল হত। আমার মার সামনে আপনাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল। অবশ্য আপনার আর আমাদের বাড়িতে আসার মতো সৎসাহস নেই বলেই আমার বিশ্বাস। যেদিন আমাদের বাড়িতে প্রথম এসেছিলেন, বাপীর মুখে শুনেছিলাম, আপনি নাকি খুব শিক্ষিত, তাই সেদিন আমার মনে জেগেছিল অপার শ্রদ্ধা, আর আজ ?·· আজ আপনাকে সেই পবিত্র দৃষ্টিতে দেখতে পারছি না। শেষ করি আজ। ভগবান আপনাকে সুমতি দিন।

ইতি—

"বন্যা"

সন্ধ্যাবেলায় জ্বরে প'ড়ে আছি। মা এসে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। হাওয়া করছেন। সেদিন কারেন্ট ফেল করেছিল বলে হ্যারিকেনটা মিটমিট করে জ্বলে উপহাস করছিল। আমার এক প্রাক্তন ছাত্র খোলা চিঠিটা এনে বললে : পড়ুন এটা ; সাহস কতখানি ! এই ধরনের অকৃতজ্ঞ জীব আপনি কখনও দেখেন নি। যার নিষ্ঠার গুণে তুই গ্রাজুয়েট হলি আর তাকেই অপমান ! অশ্রদ্ধা ···চিঠিটা পড়ুন। বুঝবেন।

চিঠিটা একবার ভাল করে পড়লাম। দেখলাম পাগলের প্রলাপ সর্বত্র। যাকে মেয়েরা ভালবাসে তাকে না পেলে এই ধরনের ক্ষুব্ধ মনের বিক্ষুব্ধ প্রকাশ ঘটে। চিঠিটা পড়ে মনে হল একটা সাময়িক মানসিক উত্তেজনার বিশেষ মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি। সেই ক্ষুব্ধ মুহূর্তটা চলে গেলে ওর কলম দিয়ে এই ধরনের লেখা আর বেরুত না। বহুদিন ধরে যা ভেবে এসেছি আজ সব সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু সৎসাহস ? এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত যার কায়িক আর আর্থিক সহযোগিতায় সংসারের ভারসাম্য স্থাপিত হতো আজ সে বাড়িতে যেতে আমার সৎ সাহস হবে না ?

যার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পড়াশুনা এতখানি হল আজ সেই অপাঙক্তেয় ? বুঝলাম আমার পুরোনো ছাত্রের হাতে খোলা চিঠি দেওয়ার অর্থ আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু আমি জীবনে কারো ক্ষতি করি নি। অযথা চিঠি দেওয়ার অর্থ কি ? অবশ্য ও যদি আমাকে অপমান করে সুখী হতে চায় তাহলে বলার কিছু নেই। আমার তো সব গেছে—শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থ, সম্মান – আমি তো সব কিছুই হারিয়েছি। জীবনে আর কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারব না। ওর ভালোর জন্যে আমাকে অনেক···অনেক দূরে থাকতে হবে, তবু জানবো জীবনে যে শিক্ষা অসমাপ্ত ছিল আজ হয়ত তা পূর্ণতা লাভ করলো।

সব কিছুকে ভুলে থাকবার জন্যে আবার পড়াশুনা শুরু করলাম। এম. এ'র নোট এনে পড়ুয়া ছেলের মতো পড়াশুনা করতে লাগলাম। প্রেসটা খুব ভাল করে চলতে লাগলো। গানের জন্যে আবার গুরুর কাছে গেলাম। দেখলাম মায়ের আবার পুরোনো হাসিতে মন ভরপুর। গান, সাহিত্য, প্রেস, কাজকর্ম নিয়ে বেশ মেতে রইলাম। একদিন প্রেসের নব বললো : জানেন সৌমেন্দুদা, বন্যাদিকে প্রায়ই আমাদের বাড়ির ফেরার পথে দেখি। মেয়েটাকে আর মানুষ করতে পারলেন না। দেখছেন না একশো কুড়ি টাকা মাইনের বেয়ারার চাকুরীতে বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, টিফিন, নেশাপান—এই সব করে যার তিন ভাগ উড়ে যায় সে আবার বন্যা-দিকে নিয়ে সংসার পাততে চায় ! স্বপ্নভরা চোখ দেখলে বিস্ময় লাগে। আমি আপনার থেকে দুশো টাকা পাই তবু বিয়ের চিন্তা করতে ভয় পাই। আপনারও তাহলে ··

কথা কেড়ে সৌমেন্দু বলে— দুটো করা উচিত ? তাইতো ! মেরে মাথা ভেঙে দেবো ! কাজ কর। ফাঁকি দিবি তো মাইনে কেটে নেবো। ওসব বাজে কথা ছাড় তো !

সৌমেন্দুদা, আপনি কি···শুনছি প্রলয়দা নাকি আর দেরি করতে নারাজ। হয়ত এ মাসেই ওদের বিয়ে হবে। তবে নেমন্তন্ন···

ওসব ছাড় না। আমার আর ভাল লাগে না। যদি নেমন্তন্ন

করে ওদের পূজোর তত্বে দেওয়া ধুতি-পাঞ্জাবী আসল আসামীর হাতে দিয়ে আসবো। নইলে "শরৎস্মৃতি" দেবো। তবে আমাকে ওরা বলবে না। কেন না আমি ওদের যা ক্ষতি করেছি এরকম ক্ষতি আর কেউ জীবনে করে নি। সেজন্যে শত্রুকে আবার বিয়ের দিন কেউ থাকতে দেয় রে?

শুনেছি ওর মা ভীষণ কান্নাকাটি করছে। আপনাকে অনেক দিন ডাকতে এসেছিল আপনি যান নি। বলেছেন: জীবনে আর যাবেন না। বন্যাদির বিয়ে হয়ে গেলে আবার যাবেন নাকি বলেছেন।

না, না, ওসব বাজে কথা, যাবো রে যাবো। কবে ওদের বিয়ে একটু খোঁজ আনতে পারিস। একবার কাকীমাকে দেখতে। যাবো।

সোমেনদা, একটা কথা শুনবেন?—নব টেবিলটা সরিয়ে পাশে বসে। কাল পথে বন্যাদির সঙ্গে দেখা। বললে কি জানেন? কি রে তোর সৌম্যদা সেই রকম গুম হয়ে আজও বসে থাকে! ছেলেটা শিশুর মতো রাগ আর মেকি অভিমান, বোকা কোথাকার? আমাকে চটিয়ে সৌম্যদা বাঁচতে পারবে? রাগের মাথায় যা তা লিখে পাঠিয়েছি।

আচ্ছা সোমেনদা, ওকি সব বাজে কথা বলছে?

না, রে আমি শেষ জবাব যেদিন হাতে দিয়ে এসেছি সেদিন থেকেই বন্যা আমাকে ভাল করে নিতে পারে নি। কেন জানি না। ওর সংসার জীবনের প্রয়োজন এত তাড়াতাড়ি কেন তা বুঝলাম না। মেয়েছেলে তো! শত চেষ্টাতেও পুরুষের মতো দৃঢ় মনের নয়। জানিস্ নব এম. এ'টা পাস করে শরৎচন্দ্রের ওপরে গবেষণা করবো। বই বার করবো। দেখ না কত বড় হবো। আর তুই আমার ভাইয়ের মতো পাশে থাকবি।

আপনি যে রিসার্চ নিয়ে পড়লেন তাতে বন্যাদি আপনাকে সার্চ করে সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। শেষে ওলট-পালট চার্জ করে ভুল পথে মার্চ করে একেবারে ব্যাণ্ডেল চার্চ ঘুরে ঘূর্ণায়মান স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন।

থাক্ থাক্ ও বাজে কথা। ডবল ইম্প্রেসনটার কালিটা একটু ঠিক করে দিস। খুব দামী কাজ।

তখন শীতের মাঝামাঝি। গায়ে গরম কাপড় জড়িয়ে পড়াশুনা করছি। পরের মাসে পরীক্ষা। পরীক্ষার ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস। প্রেসের মেসিনম্যান এসে খবর দেয়: কে এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। বিশেষ প্রয়োজন।

আরে বরুণবাবু যে! কি খবর?

বিশেষ প্রয়োজনে এলাম। বৌদি পাঠিয়ে দিয়েছেন কয়েকটা কথা বলবার জন্যে। আপনার মহৎ প্রচেষ্টার আমি সার্থক রূপ দেখতে পেলাম না সৌমেন্দুবাবু। একটা পরিবারের জন্যে আপনি এতখানি করলেন কিন্তু তবু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। বৌদির এটাই বড় দুঃখ। আপনি এটা বুঝলেন না যে প্রত্যেক ছেলে-মেয়েদের একটা বয়স আছে যখন তারা সংসারী হতে চায়। আপনি উদাসীন বলে সকলেই তো আর আপনার মতো সন্ন্যাসী নয়। আপান এতখানি ত্যাগ স্বীকার করেও যখন ঝুঁকি নিতে চাইলেন না তখন ভাগ্য বা ভবিতব্যকে কেউ খণ্ডাতে পারবে না। প্রলয় ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ও বন্যাকে বিয়ে করবেই। দাদা-বৌদি এতদিন ধরে ওকে অন্যায় সুযোগ দিয়ে মাথায় তুলেছেন, আপনি একা কি করবেন? শুনেছি আপনি অনেক করেছেন—

আরও··আরও···কিছু করতে পারতাম। ওর জীবনের আশা ছিল অধ্যাপনা করার। সে আশা আমি পূরণ করতে পারতাম। পারতাম আমি ওর চরিত্রের বাকী অংশ সংশোধন করে দিতে। পারিনি শুধু বন্যার খেয়ালী মনের জন্যে নয় ওই আপনার দাদা আর বৌদির জন্যে। বন্যা, তার মনের গোপন বাসনা কোনো-দিন জানায় নি। আবার ওরাও ক্ষুব্ধ মনে গোপন কথা কিছু বললেও আসলে বন্যা কি চায় তা আজও ও নিজে জানে না। এ কথার সত্যতা আছে আমাকে পাঠানো ওর চিঠিপত্রে। বাবা-মা যদি কঠোরভাবে ওর জীবনের পথ ও মতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো আজ

প্রলয় কেন কেউ ও বাড়িতে মাথা গলাতে পারতো না। প্রলয়ের দোষ দিচ্ছেন কেন? দোষ মূলত আপনার দাদার আর কিছুটা বৌদির। এই বয়সে এই ধরনের সামাজিক পরিবেশে ছেলেমেয়েরা একটু ডেসপ্যারেট হয়।

যা সর্বনাশ হবার তা হয়েছে। এখন একটা বিয়ের দিন ওরা স্থির করেছে। তার আগে অন্তত একবার বৌদি আর বন্যা আপনাকে কি সব বলতে চায়। বৌদির বিশেষ অনুরোধ। তা ছাড়া……

—আমি কিন্তু এ-ব্যাপারে এখনই আর কোনো গভীর চিন্তা করতে পারবো না—সৌমেন্দু গম্ভীর হয়।

—কিন্তু তার মধ্যে যে বিয়ে হয়ে যাবে।

—উপায় কি বলুন? জীবনের বহু মূল্যবান সময় দিয়ে একটা পরিবারের জন্যে যা করলাম তার বিষময় ফল তো দেখলেন। একটা চিঠি দেখাতে পারি। বুঝবেন মেয়ে জাতটার আসল স্বরূপের কথা। আর পারি না বরুণবাবু, আমার সব গেছে—অর্থ, মান, সম্মান, চরিত্র, শিক্ষা···আমি ··আমি আজ কোন অধঃপতনে নেমে গেছি জানেন? কতদিনের সখ শরৎচন্দ্রকে নিয়ে গবেষণা করবো আজও তা হল না। আর কবে হবে? অপরকে অযাচিত সাহায্য করতে গেলে নিজের এই রকম বিপদই হয়!

সব বুঝলাম। কিন্তু বোনের বিয়েতে দাদার কি কোনো কর্তব্যই নেই সৌমেন্দুবাবু?

—তাই ভাবছি। কত খরচ করবেন স্থির করেছেন?

—আপনি বলুন।

—এক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। বন্যা প্রলয়দার আয় ব্যয় এবং পারিবারিক অবস্থা সব কিছু জানে। তা সত্ত্বেও যখন রাজি হয়েছে তখন উপযুক্তভাবে বিয়ে দেওয়া দরকার। আমি কালই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দশ হাজার টাকা কাকীমাকে দিয়ে আসবো। তাহলে হবে তো?

—না, না, আমি টাকার জন্যে আসিনি। আপনাকে বৌদি আর বন্যা বিশেষ করে ডেকেছেন। আপনার সাক্ষাৎ ওরা চায়।

আপনার কাছে ওদের কি সব কথা বলার আছে তা সব বলবে বিয়ে হয়ে গেলে আর হয়ত বলা হবে না। তাই পরীক্ষার পর গিয়ে লাভ নেই ভাই। যা হোক এই ক'দিন বাকী আছে। একবার আসুন। বেশি সময় লাগবে না।

—ঠিক আছে কাল যাবো।

অনেক দিন পরে আবার সোনাঝরা রোদ দেখলাম। ছাদে বই নিয়ে পড়তে বসেছি। বেশ মিঠে লাগছে। দেখলাম পাশের গাছটা এই ক'দিন আগে সুন্দর পত্রপুষ্পে সুশোভিত ছিল আজ পাতাগুলো শুকিয়ে ঝরতে সুরু করেছে। গাছটার সুন্দর দেহ যেন কেমন মলিন বিবর্ণ হয়ে গেছে। যেন কি বিরাট এক ধাক্কায় তার পূর্ণ যৌবনকে নষ্ট করে দিয়েছে। এই গাছটার কথা ভাবতে ভাবতে কখন ভুলে গেছি বাহ্যজগৎ—তা মনে নেই। এমন সময় ডাক পিয়ন এসে ডাকলে —এক্সপ্রেস আছে বাবু!

খুলে দেখি পি. আর. ও. হয়ে উড়িষ্যা ডিভিসনে পুরীতে আমার পোষ্টিং হয়েছে। তিন দিনের মধ্যে যেতে হবে। ওদের ব্রাঞ্চ অফিসে লোকের বিশেষ প্রয়োজন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে পুরীতে পৌছতে হবে। বুঝলাম জীবনে আর পড়াশুনা হবে না। ভাবলাম আমাকে ভগবান এতো বড় একটা সুযোগ দিয়েছেন এ ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়। এ বিয়েতে থাকবো না? কিন্তু······আমার আদর্শ যেখানে পরাভূত, সেখানে মাথা নত করা উচিত হবে না। তাছাড়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে এই সুযোগ আর হয়ত আসবে না! ওখান থেকেই পড়াশুনা করবো এবং এই বছরই এম. এ. পরীক্ষা দেবো। আমি তো মরে গেছি। আর নয়। গুরু বলতেন: মিথ্যা মোহে ডুব দিও না, সময় মহামূল্য। সন্ধ্যায় না হয় যাওয়া যাবে।

প্রকৃতি খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে নিলো। মাঠে মাঠে ফসল ফলতে লাগলো! জিনিষ পত্রের দাম কমে গেলো! সমাজে আবার শান্তি ফিরে এলো! সে মধুর সন্ধ্যায় একটা দামী শাড়ি আর কিছু তাজা রজনীগন্ধা, কিছু গোলাপগুচ্ছ

নিয়ে গেলাম বাড়িতে। অনেক দিন না হলেও মনে হলো বহু যুগ পরে আবার সেই পুরোনো পথে নতুন মন নিয়ে যাচ্ছি। নিস্পৃহ চিত্ত, প্রফুল্ল মনে পান চিবুতে চিবুতে গেলাম। দেখলাম গলির কোনো রকে আড্ডা নেই। অন্যদিনে এই সময় গলির রকগুলো সব রম্রম্ করতো। বেশ ভালো লাগলো। আকাশ পরিষ্কার। চাঁদ-তারা সকলেই বেশ খুশি দেখলাম। শাড়িটা টেবিলে রাখলাম। ফুলগুলো তার পাশে। একরাশ চুল এলো· মেলো এমন অবস্থায় বন্যা এলো আমার সামনে। উদাসীন বিভ্রান্ত ওর ভাব। কাকীমাও অতৃপ্ত চোখে তাকালেন, কেমন যেন দুঃখ, কিছু কথা বলতে নারাজ। আমার কাছে এসে বসে পড়লেন। চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়াতে লাগলো। সৌমেন্দু অবস্থাটা একটু হাল্কা করে বলতে লাগলো: আমাদের প্রলয়দা খুব হাসিখুশি মানুষ। দুশ্চিন্তা করবেন না। সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যাবে। কি করবো বলুন, কালই আটটা চল্লিশ মিনিটের পুরী প্যাসেঞ্জারে চলে যাচ্ছি। যেতেই হবে। নিতান্ত নিরুপায়। আমি একবার প্রলয়দার বাড়ি যাবো। কি, কিছু বলবেন? এখুনিই উঠবো। কি বন্যা. কিছু বলো!

চোখের জল মুছে কাকীমা বললেন: আমরা কোথায় দাঁড়াবো বলো। কে আছে আমাদের? সংসারই বা চলবে কি করে? বন্যা যা উপায় করে ও নিজের জন্যে সব সঞ্চয় করে রেখেছে। কি বলবো তোমায় বাবা, বন্যা এখন বিয়ে করতে চায় না।। প্রলয় জোর করে করবে। জানি না, আমার সম্মান কোথায় গিয়ে ঠেকবে। আমাদের বংশের যে মর্যাদা, যে ঐতিহ্য আছে তা সব অসম্মানের বন্যায় ভেসে যাবে। জানি না আমরা কোথায় গিয়ে ঠেকবো।

উত্তরে সৌমেন্দু বলে: প্রলয়দার মুখে শুনেছি ও বারোশো টাকা মাইনে পাবে। দেরাদুনে বদলী হবে। গাড়ি পাবে। ওখানে ওরা সুখে থাকবে। আমার বাড়িতে গেলে কি এত সুখ ও জীবনে পেতো? আমাদের খেটে-খাওয়া সঞ্চয়ী, সুখী মধ্যবিত্ত পরিবার।

ও জীবনে যাকে নিয়ে সুখী হতে চায় তাতে বাধা দিচ্ছেন কেন? জোর করে বাবা-মার মতে মত দেওয়ার দিন আর নেই, কাকীমা।

—কিন্তু বন্যা তো আজও ওকে বিয়ে করবে বলে স্থির করে নি। তুমি কি আজই যাচ্ছ?

—ওদের বিয়েতে আমি থাকতে পারছি না। তাই একবার কর্তব্য সারতে এসেছি। বন্যার যদি কিছু বক্তব্য থাকে ও নির্ভয়ে বলতে পারে। শুনবো। আমার অপরাধ থাকলে ক্ষমা চাইবো। জীবনে ও যে সব ভুল করেছে তা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। শুধু জগতের চরম সত্যটা অনুধাবন করতে বলবো। অযথা মানুষকে অপমান করা অথবা মন রাখবার জন্যে আমার নামে বাজে ছেলে-দের কাছে যা তা বলে সৌমেন্দু রায়ের সম্মানহানি কেউ করতে পারে নি, পারবেও না। আজ সে খাঁটি সোনাই আছে। থাকবে। তাতে বাইরের বিষাক্ত ধুলো পড়ে মলিন হতে পারে কিন্তু আবার সামান্য ফুঁ দিলে সে কলঙ্ক মুছে যাবে। শুনুন, বাজে কথা থাক্, কাল বোনের বিয়ে বলে ব্যাঙ্ক থেকে সামান্য টাকা এনেছি। এই গোছটা রেখে দিন। চললাম।

বেরিয়ে এলাম। তিনজনই বাইরে এলো। কাকীমাকে প্রণাম সেরে প্রলয়দার কাছে গেলাম।

অন্ধকার গলি। দু'পাশে ভাঙা পচা নর্দমা। দুর্গন্ধময়। পরপর গাদাখানেক হুমড়িখেকো মাটির ঘর। পচা মাছের গন্ধ। ধেনো মদের ঝাঁঝালো গন্ধ। ভেতরে ছেলে-ছেলে নিয়ে তুলকালাম ঝগড়া। স্ত্রীকে মাতাল স্বামী পিটছে। আমি বাইরের ভাঙা দ্বারে নক্ করতে একটা ছেঁড়া প্যাণ্ট পরা, লাল চোখ, হিন্দী গান গাইতে গাইতে এসে বললো: কিরে কিছু বলবি? হ্যাট শালা! রঙ নিতে এসেছিস্...জানিস গুরুর বিয়ের মহড়া চলছে। শালাদের পেট পুরে মদ খাওয়াবো। ধেনোর সঙ্গে কিছু রামও আছে! পাবি কোথা শালা এত খাঁটি মাল! এই বাড়িতে নিজের হাতে তৈরি রে শালা। হ্যারিকেনটা যে দিকে জ্বলছে ঐ দিকে এগিয়ে যা। গুরুর ঘর পাবি। জোরে ভেড়ার মতো ডাক দিবি না। বুঝলি?

এগোচ্ছি ঠোক্কর খেতে খেতে ; অন্ধকারে গেলাম। ডাকলাম। কিছুক্ষণ পরে অন্ধকারের মাঝে প্রলয়ের গলা পেলাম। বললাম : কাল তো ভাই পুরী যাচ্ছি। তাই একবার শেষ দেখা করতে এসেছিলাম। বন্যাদের বাড়িতেও গিয়েছিলাম।

আবেগে প্রলয় বুকে জড়িয়ে ধরলো : আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম, সৌমেন্দুদা। আপনার মহৎ উদ্দেশ্য জানতাম। কিন্তু নানান বিরূপ পরিস্থিতির জন্যে আপনার নামেও আমরা অশোভন কথা বলেছি। দাদার কাছে ক্ষমা চাইতে ভাইয়ের লজ্জার কিছু নেই। বিয়ের অনুষ্ঠানে আপনি থাকলে বেশ আনন্দ পেতুম। কিন্তু আপনি নিরুপায় দেখছি। আশীর্বাদ করুন সৌমেন্দুদা আমরা যেন জীবনে সুখী হতে পারি। আমাদের ভবিষ্যৎ যেন আলোকোজ্জ্বল হয়। বন্যাকে যেন আনন্দে আজীবন রাখতে পারি। আপনার মহৎ অবদানের মূল্য কেউ দিতে পারে নি সৌমেন্দুদা।

সৌমেন্দু বলে : 'স্মৃতি হয়ে থাকবে বিগত দিনের ভুল বোঝাবুঝি, ক্ষয়-ক্ষতি, বিফলতা আরো কত কিছু। সে কথা না ভেবে অনাগত ভবিষ্যতের প্রাঙ্গণে কর্তব্যের মাঝে এগিয়ে যেতে হবে

[৬]

হাওড়া ষ্টেশনে ভীষণ ভীড়। ব্রীজটা সেদিন বেশ জ্যাম ছিল। সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে মাকে প্রণাম জানিয়ে ষ্টেশনে পৌঁছাতে প্রায় আটটা কুড়ি হয়ে গেল। একাই যাচ্ছি। কাউকে বলি নি। নিজের নির্বাসনে অপরকে চিন্তিত করবো কেন ? সেজন্য উদাসভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে চলেছি। অফিসের কাজ। কোয়ার্টার পাবো। রিজার্ভ সিট। তাই ট্রেনের ভাবনা চিন্তা নেই।

দু' একটা কামরা খুঁজছি। পাশে কুলিটা আমার সামান নিয়ে অপেক্ষা করছে। হঠাৎ পাশ থেকে পরিচিত বামা কণ্ঠ :

সৌমেন্দুদা, চলো, চলো ঐ (হাত দেখিয়ে) পাশের কামরায়। চলো চলো, বেশি সময় নেই। অনেক বলার আছে।

আমি বিস্ময়, বিমূঢ়! এমন সময় ওর দেখা পাবো এ যেন দিবাস্বপ্নের মত মনে হল। চেয়ে দেখলাম মুখের দিকে। লাল গোলাপের একটা বড় গোছা আর রজনীগন্ধার বাঁধা মোড়াটা নিয়ে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে বিস্ময়ভরা চোখে দাঁড়াতে দেখে আমার হাতটা ধরে বললো: চলো, অনেক কথা আছে। বসে বলবো। অনেক অনেক ··অনেক কথা।

—কিন্তু তুমি এখানে কেন?

—বসো, বলছি। আজ থেকে একটা বছর আগে প্রলয়দা আর আমার বাবা তাজা রজনীগন্ধার সুরভি নিয়ে তোমাকে সি-অফ করতে এসেছিল। তখন আমার অনুরোধ ওরা রাখেনি। আজ ওদের মধ্যে একজন চিরদিনের মতো চলে গেছে অন্যজন বিয়ের আনন্দে মত্ত।

—না, না, না—বিরক্ত হয় সৌমেন্দু। এ ভাল হচ্ছে না। আজ তো তোমার কুমারী জীবনের যবনিকাপাত হল। কাল থেকে তুমি সংসার জীবনের তোরণদ্বারে প্রবেশ করবে।

—কুমারীত্ব বলে আমার কিছু নেই সৌম্যদা, এতো আপনি জানেন। জীবনটাকে নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলতে রাজি নই। আমার যৌবন নিয়ে চোদ্দ বছর থেকে জুয়ো খেললাম। কিছুই পেলাম না সব মেকি আর বোকা ছেলেদের দু'চোখ ভরে দেখলাম। হ্যাঁ, তোমার কথায় আসি। তোমার যে-ফুল আমাকে দিয়েছ তার উদ্দেশ্য বুঝলাম আমার জীবন্ত পবিত্র ভবিষ্যৎ জীবন। কিন্তু তা কি কোনোদিন সম্ভব? কেউ কি জেনে-শুনে বিষ পান করতে পারে? কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়ে কালকে তাই করতে হবে। কেউ কাঁদবে না। যে কাঁদার ছিল ভগবান তাকে সরিয়ে দিচ্ছে। আমি তার অনেক ক্ষতি করেছি। হাতটা ধরে বলে চলে—এখনও ছাড়তে পারছি না। এই মধুর হাতে যেদিন প্রথম ছাদে

আংটি পরিয়ে স্থায়ী সুখ-স্বপ্নের নীড় রচনা করেছিলাম তার স্মৃতি বোধ হয় আজ ভুলে গেছ। ভীষণ ভোলা মন তোমার। যা হোক তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জেনে ফুলগুলো ফেরৎ দিতে এসেছি। ধর, তুমি সিমলায় যাচ্ছো, আমি এসেছি সি অফ করতে। নেবে না তাহ'লে?

—কিন্তু এবার ট্রেনটা যে ছাড়বে। তোমাকে আবার ফিরতে হবে।

—হবে তো বটেই। ব্যস্ত হয়ো না। সেদিন অর্থাৎ গত বছর এই সময় প্রলয়দা এসেছিল রজনীগন্ধা নিয়ে। এবার আমি, বুঝছো এক বছরের ব্যবধানে কত বিচ্ছেদ। গত বছর প্রলয়দা এবার আমি। সবাই একা একা। তাছাড়া গত সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত জানতাম তুমি আমার বন্ধু। আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক হতে পারে! অন্তত আমার দিদিমা, বাবা, মা তাই আশা করেছিল। কিন্তু গতকাল, যখন টাকার তাড়াটা দেখলাম, ভাবলাম সত্যিই তুমি আমার আদর্শ দাদা। এতদিন পরে আমরা আমাদের সেই হারানো নিজের দাদাকে পেয়েছি। সারাটা রাত কেউ ঘুমায় নি। আজও আমাদের রান্না হয়নি। বুঝছো আমার আইবুড়ো-ভাত কেমন খাওয়া হয়েছে?

—কিন্তু লোকে কি ভাববে? না, না চলে যাও। ফিরে যাও।

—এখন আর লোকলজ্জা বলে আমার কিছু নেই সৌম্যদা।

—আমার তো আছে। আমাকে লোক যা-তা ভাববে। সন্দেহ প্রকাশ করবে। তুমি ফিরে যাও। সুখী হবে। দাদার কথা রাখো তোমার ভবিষ্যৎ ভালো হবে।

তোমার শিল্পী-জীবনে যে নারীর প্রয়োজন, আমাকে সে ভাবেই তো নিতে পারো। তুমিতো পুরীতে একা থাকবে। "তোমার একজন দাসীরও ত প্রয়োজন, আমাকে সঙ্গে যেতে দাও।" চন্দ্রমুখীর মতো যদি একথা বলি; দেবদাসের মতোই উত্তর দেবো: ছিঃ তা হয় না, আর যাই করি এত বড় নির্লজ্জ হতে পারবো না। নয়তো

শ্রীকান্তের মতো বলবো : লক্ষ্মী, তোমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি করে ?

গাড়িটা চলতে শুরু করল। সৌমেন্দু উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে : না, না, এখনও সময় আছে। নেমে যাও লক্ষ্মীটি। যা চাও তাই দেবো। কত টাকা চাও। আমি দাদা……

—বন্যা সৌমেন্দুর হাতটা চেপে ধরে : ব্যস্ত হয়ো না সৌম্যদা। আমি এই রিজার্ভ কামরায় থাকবো। ধরলে টাকা দেবো। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। সারাটা দিন অভুক্ত আমি। আমার মানসিক অবস্থা বুঝবে না তুমি। তোমার সম্মানই বড় বলে ভাবছো। তুমি তো এত বড় স্বার্থপর ছিলে না।

—এটা সম্মানের প্রশ্ন বন্যা। মেয়েদের মতো স্বার্থপর আর কেউ হয় না। পুরুষেরা অনেক উদার, অনেক মহৎ। আমার কিছু লুচি আর আলু ভাজা আছে খাবে ? আসার সময় আবার মায়ের কথা শুনতে হয়েছে।

—দাও। আজ তুমি যা দেবে তাই খাবো। বিষ দাও তাই খাবো।

—আজ তোমার সম্বোধন আর কথাবার্তায় আমূল পরিবর্তন দেখছি। কি হয়েছে বলতে পারো ?

—একটু আগে তো বললাম—এতদিন জানতাম তোমার সঙ্গে আমার ভবিষ্যতের সম্পর্ক হবে ··কিন্তু না, ভুল, সব ভুল ! তুমি যে আমাকে তোমার নিজের ছোট বোনের মতো সত্যিকারের ভালবাস তা কাল রাতে বুঝেছি। তাই সব রকমের মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে আজ দাদার পায়ে আত্মসমর্পণ করতে এসেছি। দাদা যা বলবে তাই মানবো।

—প্রথমেই অসম্মান করে যে সম্বোধন করলে তাতে দাদার মর্যাদা কি রইলো ? সম্মান নিয়ে তো অনেক দিনই ছিনিমিনি খেলেছ, আর কেন ? যাক্ আর খাবে ? আমার আরও খাবার আছে। প্রেসের নবটা সকালে দেখি এক গাদা খাবার এনে হাজির

করেছে। ও জানো, হাতে খাবারের বাক্সটা দিয়ে প্রণাম করে কেঁদে ফেললো। গ্রামীণ সরলতা না দেখলে বোঝা যায় না। ওকে প্রেসটা দিয়ে এসেছি।

—তোমার ঘর সংসার হবে না? সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছ কেন?

—ও সব কথা পরে হবে। তুমি এলে কেন?

—তোমার অভ্রান্ত ভাগ্য-গণনার অনেক উদাহরণ পেয়েছি। আমার মা সারাটা রাত ঘুমায় নি। হা-হুতাশ করেছে। আমার ভাই এ যুক্তি দিয়েছে। আমি তোমার সঙ্গে যাবো। তুমি আমার যা ভাল বোঝ তাই করো।

—এই ভাবে তুমি আজও আমাকে নিয়ে ছেলেখেলা করবে? আমার সম্মান নিয়ে মজা করবে?

—তোমার পায়ে হাত দিয়ে সত্যি বলছি সৌম্যদা, আর নয়, এবার তোমার সঙ্গে নিজের দাদা ভেবেই মিশবো। তোমার বিপদে-আপদে তোমার পাশে থাকবো; অনেক বড় করে তুলবো; তুমি অনেক বড় হবে। এ স্বপ্ন আমি কাল দেখেছি। আমাকে …আমার এ বিপদে আঁধারের মাঝে ফেলে দিও না সৌম্যদা।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে অনেক স্বপ্নই দেখছ।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম গতকাল বস্তী বাড়িতেও গিয়েছিলেন শুনেছি। যেতে খুব কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়ই। পরের দিন সকালেই প্রলয়দা আবার সোহাগভরে তোমার এই আগমন বার্তা বলতে এসেছে। পীরিত কত? কাল বিয়ে আজও দেখা করে সব কথা বলা চাই। বুঝি না কি অমর প্রেম! হো হো করে হেসে: তারপর শুনলুম পথে নাকি বিশু পাগলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ও বস্তীবাড়িটার একটা ভাঁড়। হাসিতে মাৎ করে রাখে।

—বেশ সুখে থাকতে তাহলে।

—সে জন্যেই তো পালিয়ে এসেছি দাদার কাছে।

—সত্যি, ঠিক এই মুহূর্তে তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না। তুমি দেবী না মানবী, পেত্নী না প্রতারক! না, না এ আমার খুব

খারাপ লাগছে। কি কৈফিয়ৎ দেবো? বন্ধা, মানুষের চোখে ফাঁকি দেওয়া যায়। নিজের বিবেকের কাছে মানুষ ভীষণ অসহায়। সেখানে ফাঁক বা ফাঁকি কোনোটাই চলে না বুঝলে? এতদিন কত ছেলেকে ফাঁকি দিয়েছ আজ নিজে ভীষণভাবে ফাঁকে পড়েছ। তাই দিশেহারা হয়ে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছ? আমি কি তোমার পথের দিশারী? তুমি তো এক কালে আমার ভীষণ ক্ষতির জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলে। আজ যদি তোমার সে ক্ষতির চিন্তা করি? মনে কেমন লাগবে? দাদা বলে পায়ে লুটিয়ে পড়েছ। সেদিনকার সেই ক্ষোভ, রাগ আর ঘৃণা আজ চরিতার্থ করে নেবো?

—তা নিতে পারো। আমি তো আধ-মরা হয়েই আছি। এবার না হয় আমাকে হত্যা করে চলন্ত ট্রেন থেকে বাইরে ফেলে দাও। এই যা···ভোর হয়ে এল। তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়। আমি হাওয়া করি! হাজার হোক নিজের দাদা তো! বলি আর কতদূর যেতে হবে?

উদাসভাবে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে সৌমেন্দু: জানি না, কোথায় যাচ্ছি; কেন যাচ্ছি। কতদূর যাচ্ছি। তবে ধ্বংসের পথে যাচ্ছি এ কথা বলতে পারি। আর আমার সঙ্গে একজন পাগলীকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছি।

*　　*　　*

ঘর দেখিয়ে সব সুন্দর করে সাজাতে বললাম। আমি কাপড় কেনার নাম করে সোজা পোষ্ট অফিসে গিয়ে তিনটে টেলিগ্রাম করলাম—প্রলয়ের কাছে, মায়ের কাছে আর কাকীমার কাছে।

ফিরে বললাম: কি বন্ধা কাউকে জানাবো? তুমি পালিয়ে এসেছ?

—না, যাকে পেয়েছি তাকে নিয়ে এখানে ঘর পাতবো। মনে নেই সেই চিড়িয়াখানা থেকে ফেরার পথে খিদিরপুর ব্রিজে বেড়াবার সময়ে বলেছিলাম: চলুন, কোথাও চলে যাই। অনেক

…অনেক দূরে। আমরা দু'জনে গভীরভাবে ভালবেসে নতুন করে সংসার পাতবো। তুমি ভুল বুঝে কতদিন দূরে সরে রইলে। শাস্তি তুমিও পেয়েছো। তোমার মন ভেঙে গেছে। জীবনে আর কিছু করতে পারো নি।

—সে কার জন্যে ? আমার না তোমার ? পাঁক থেকে তুলে একটা জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েছিলুম। লোকের ভাল করলে শুনি নিজের ক্ষতি হয়। যাক্ শোনো, একবার অফিস থেকে ঘুরে আসি। তুমি কোথাও যেয়ো না। কথা রেখো।

মানসিক শান্তি কিছুটা ফিরে পেলাম। সহকর্মীর সঙ্গে কিছুটা আলাপ হ'ল। আমার টাইপিষ্ট এক স্কচ মহিলা। পাশের চেয়ারে বসেন। কিছুটা আলাপের পর সরাসরি প্রশ্ন করলেন :

—Are you bachelor, Mr. Roy ?

—Sami.

—i, e, going to be.

—May say.

—But you are not looking fresh to-day.

—Is there any sign ?

—You know, my friend, face is the index of mind. You are facing some danger. Is it not ?

—Nay destruction. Perhaps, I will wither away for ever.

—Then you should marry at once. She only can solve your problem. You can enjoy your life with full of pleasures. Life—prosperous life.

উদাসভাবে চেয়ে বললাম :

Life ! Life is a tale, told by an idot.

—I love poet-like manner. You can consult with me.

ভাবলাম টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাস।…টাইপিষ্ট না শেষে টাইট করে দেয়। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম। সন্ধ্যা নামতে সুরু করল। বন্দা সাজগোজ করে আমার হাত ধরে বেড়াতে বেরুলো সমুদ্রের ধারে। অনেক দিন পরে সমুদ্রের ধারে এসে উদাসভাবে রত্নাকরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

"তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি!"

—কোত্থেকে বললাম বলতো? আউট নলেজ তোমার ভীষণ কম। আজকালকার ছাত্ররা বইয়ের বাইরে যেতে রাজি নয়। নতুন কিছু শিখবে কি করে? কত সুন্দর লেখা শুনবে?

"আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার—বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন
আত্মীয়ের কাছে।"

—ও সব মনে নেই। আচ্ছা বলো তো এটা কোন্ কবিতার?

"ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা,
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে ঝুলনখেলা
নিশীথবেলা।"

—এর চেয়েও উল্লেখযোগ্য লাইন হল:

"বঁধূরে আমার পেয়েছি আবার, ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে প্রলয়রোল।
বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার কী হিল্লোল!
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার কী কল্লোল!"

—জানো সৌম্যদা, কবিতা পড়ে তোমার মাথাটাও কবিতা-মার্কা হয়ে গেছে। আচ্ছা বলো, বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম উপন্যাস

লেখেন কে ?

—প্রথম বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৫৭ সালে—সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময়। টেকচাঁদ ঠাকুর—আলালের ঘরের দুলাল। অবশ্য কেউ কেউ বলেন ক্যাথারিণ মুলেন্স—ফুলমণি ও করুণার বিবরণ।

—না, না, হল না, হল না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', তাও জানো না ?

—অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সফল উপন্যাসের স্রষ্টা হলেও বঙ্কিমের আগে বাংলা সাহিত্যে সার্থক সামাজিক উপন্যাস লেখেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—স্বর্ণলতা। গভীর মননশীল লেখার কথা বললে বলবো রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি। এই উপন্যাস পড়ে শরৎচন্দ্র দারুণ অনুপ্রাণিত হন এবং পরে পাওয়া যায় গৃহদাহ।

—তোমার সব কথায় শরৎচন্দ্র। আচ্ছা, বলোতো ভারতীয়দের মধ্যে কোন বাঙালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নাট্যাভিনয় করেন ?

—তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি দরদী বাংলার মরমী শিল্পীকে আমি যতটা ভালবাসি তার চেয়ে আরও অনেকে অনেক বেশি ভালবাসে। শরৎচন্দ্রের জীবন জানলে তুমি একথা বলতে না। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও তাঁর সম্প্রদায়।

—সাবাস ! আচ্ছা বলোতো ভারতীয়দের মধ্যে সব চেয়ে বেশি রকম ভাষা জানতেন কোন বাঙালী ?

—হরিনাথ দে। ৩৪টা ভাষা।

—আমার শেষ প্রশ্ন হল বাংলা সাহিত্যে কোন বাঙালী প্রথম ভারতীয় একাডেমী পুরস্কার পান ?

—কবি জীবনানন্দ দাশ।

—প্লিজ আর একটা। আর একটা। বলো কাইগুলি। কোন বাঙালী প্রথমে ইংরেজী কবিতা এবং পরে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করেন ?

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। নাও আর নয়। চলো এবার। রাত হচ্ছে। নতুন জায়গা, আবার কাল।

—না, না, এত তাড়াতাড়ি না, আর একটা প্রশ্ন আছে। এখনকার মিনি পত্রিকা সম্পর্কে তোমার কি মত ?

—এটা একটা নতুন কিছু বলে মনে হয় না। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা থেকে গীতাঞ্জলি পর্যন্ত ছোট আকারে বেরিয়েছে। শরৎচন্দ্রের বইও আগেকার লাইব্রেরী দেখলে মিনি পত্রিকার সাইজের পল্লীসমাজ, দেবদাস পাওয়া যাবে।

—আজ তোমাকে খুব ভাল লাগছে সৌম্যদা। তোমার এতো আউট নলেজ আছে জানতাম না। পথে-ঘাটে কত গ্রাজুয়েট আছে তুমি···সত্যই···তোমার সঙ্গে তুলনা চলে না।

*　　　　*

পরদিন অফিসে যথারীতি গেলাম। পানও মুখে ছিল। আমার চেয়ারে বসতেই রোজালিন আমার পাশে এসে সহাস্যবদনে বললে : You are looking very fresh to-day Mr. Roy. Then your problem has been solved ?

—What' s problem ? I have no burning problem, my friend. Young mind fluctuates frequently. That's quite natural.

—But I find every where abnormal in your day-to-day life. You have a soft corner in your heart. Don't be restless. You will be great in your life. Be settled.

আমার খামখেয়ালীস্বভাবের কিছু কথা আবেগভরে বলেও ফেললাম। শুনে বেশ রহস্য অনুভব করলো রোজালিন। হল্যাণ্ডে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানালো সে। তারপর কাজ। একটানা কাজে ডুবে গেছি। সন্ধ্যায় ভ্রমণসূচী আছে সেখানে হাত দেওয়া অসম্ভব। সব ফেলে ঘরে ফিরলাম।

—আজ আমরা স্বর্গদ্বারের দিকে যাবো যেদিকে জাহাজের

গতি নির্ণয়ের জন্যে বড় আলোটা আছে—ঐ দিকে যাবো আমরা। আপত্তি আছে ?

—না, কিন্তু সৌম্যদা······

—কিন্তু আবার কি ?

—না, আজ তোমাকে খু··ব ক্লান্ত, চিন্তিত দেখাচ্ছে।

—তোমার যত সব উল্টো চিন্তা। রোজ্যালিন আমাকে খুব Fresh লাগছে বললো, আ···র তুমি ঠিক তার উল্টো! দুপুরে ঘুমাওনি বুঝি ?

—না, সৌম্যদা না, এইভাবে চেপে গেলে ক্ষতি হবে। তোমার রোজ্যালিন কি বললে।

—আমি ভাবাবেগে আমার অনেক কথা বলে ফেললাম। সব শুনে বললে: You should marry at once.

—আমিও তো তাই বলছি সৌম্যদা। কিন্তু তোমার আপত্তি কি বুঝছি না।

—চলো ঐ স্বর্গদ্বারের দিকে। জানো, এর একটা সুন্দর ইতিহাস আছে। তোমাকে বলবো। ভারী ভাল লাগবে।

—ইতিহাস কি মানুষের মনের কথা বলতে পারে ? শুধু ঘটনার একটানা বিরামবিহীন প্রবাহ নিয়ে শুকনো পাতা ভর্তি করে। তাতে মন কই ? মমতাজের মনের কথা কটা লেখা হয়েছে। তার কবর নিয়েই ঐতিহাসিকরা মাথা খারাপ করে বসলো। কত লোক, কত দিন, কত বছর লেগেছে, কোথা থেকে কোন পাথর এসেছে—এই সব। জেবউন্নিসার কথা কে ভেবেছে ? মুবারককে সে কিভাবে পেতে চেয়েছে ? কত দিন তার জন্যে প্রতীক্ষা করেছে তার খবর কোন ঐতিহাসিক বলেছেন ? তাহলে আর ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান দেখে কি লাভ ? একটু রেগে বলে: ও স্বর্গদ্বার দেখতে হবে না। কবে কে স্বর্গে গেছে জেনে কি লাভ ? তোমার কি আপত্তি আমাকে খোলাখুলিভাবে বলো।

—ও তুমি বুঝবে না বন্যা, বুঝবে না। আমার অবস্থা যদি তোমার হতো, আজ তুমি পাথার পুরীর এই হোটেল

বাড়িটার চারদিকে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে। আমি অনেক শান্ত মনের মানুষ বলে এত বড় একটা সমস্যাকে ঠিক স্রোতের প্রবাহে বইয়ে নিয়ে যেতে পারছি।

বন্যা বিরক্ত হয়ে বলে : ছাই পারছ। তাহলে আর সারাটা রাত জেগে বসে থাকতে না। ভোর বেলা আমার বিছানা থেকে উঠে দেখি—তোমার বিছানার পাশে টেবিলের আলো জ্বলছে। আর তুমি মাথা-ঘাড়-গুঁজে একটা খাতার উপরে মুখ থুবড়ে ঘুমাচ্ছ। খাতাটা জোর করে তুলে নিলাম। তাতেও তোমার খেয়াল নেই। খাতাটা পড়ে বিস্ময়বোধ করলাম। আচ্ছা সৌম্যদা, বাবা মা একটা নরপশুর হাতে তোমার নায়িকাকে তুলে দিলে! আর সেই পশুটা তার সুন্দর দেহটাকে উপভোগ করে ফেলে দিল সমাজের ডাষ্টবিনমুখো নরপশুদের কাছে। তারা (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) তারা তাকে তাদের বিলাসের সামগ্রী করে সমাজের বুকে কিছু অবাঞ্ছিত কীটের সৃষ্টি করলো! তুমি (কেঁদে) এমন লিখলে কেন···কেন···

—তুমি কাঁদছ বন্যু! সাহিত্য বাস্তবের সামগ্রী নয়। সমুদ্র দেখে নিছক কল্পনা করে লেখা। গত রাতে ঘুমাতে পারিনি, সত্য। তাই একটা বকচ্ছপ লিখে ফেলেছি। ঘরে গিয়ে আমি ছিঁড়ে ফেলবো। ও নিয়ে চিন্তা করো না।

—তোমার মনের দ্বিধা আজও গেল না সৌম্যদা। আমার মনে হয়, এই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে এখনই প্রাণ বিসর্জন দিই!

—লাভ নেই। সমুদ্র কাউকে নেয় না। তুমি আবার ফিরে আসবে।

—রাইচরণের খোকাবাবুকে কি সমুদ্র নেয়নি? নিমাই সন্ন্যাসের রহস্য কি আজও এখান থেকে উদ্ধার হয়েছে?

—না, জানো, আজ দুটো দিন কাটলো। এক্সপ্রেস টেলিগ্রামের কোনো উত্তর পেলাম না—না মায়ের, না কাকীমার না প্রলয়ের···

—প্রলয়দার? তার সঙ্গে কি প্রয়োজন?

—উত্তেজিত হয়ো না বন্যু। আজ তোমাদের ফুলশয্যার

রাত হতো। সে মধুযামিনী ছেড়ে সমুদ্রবিলাস! ভাবি, ভবের কি অদ্ভুত লীলা! কোথায় ছিলাম, আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি! একটা সুন্দর দাম্পত্য জীবন আমার জন্যে ভেঙে গেল। আমার মধুর কণ্ঠ যত সমস্যার সৃষ্টি করলো! আজকের রাতের রানী হতে তুমি। কত লোক আসতো। দেখতো। কত দামী শাড়ি পেতে। ভেবে দেখতো! আর আজ! কথায় বলে আজ রাজা কাল ফকির! জীবনে আর রাজা সাজা হল না বন্যা। একেবারে মৃত্যু শয্যায় আর একবার রাজা সাজবো! সৌমেন্দুর বুক ভেঙে যেন দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

—তোমার তো আজও সে সুযোগ আছে সৌমাদা। তুমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিচ্ছ। এ ভুল পরে বুঝবে।

—যেদিন প্রথম সাল্‌খের জয়শ্রী ঘোষকে ছেড়ে আসি তার কথা শুনে তুমি এই কথাই বলেছিলে বন্যা। এরা কেউ লক্ষ্মী নয়। আমার ভাগ্যে কোনোদিন লক্ষ্মী জুটবে না। আমি তো সরস্বতীর বরপুত্র। বিপদ এখানেই! চলো, এবার বাড়ি চলো। অনেক রাত হলো।

—না, আজকের এই পূর্ণিমা ভরা রাতটা আর একটু উপভোগ করবো সৌম্যদা। তুমি আমার পাশে বসো। দেখছ না কি উজ্জ্বল মধুর চাঁদের আলো। সেদিনও ছিল এমনি এক রাত যখন প্রাণবিধুরা পবনহিল্লোল তরুদলকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছিল; জেসিকা তার ধনী পিতার বাড়ি থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে এসে এক খামখেয়ালী আর বেপরোয়া স্বামীর হাত ধরে ভেনিস থেকে বেলমোটে পালিয়ে এসেছিল।

—এমনি এক রাতে তুমি প্রলয়কে গভীর ভালবেসে, প্রেম ও নিষ্ঠার আশ্বাস দিয়ে তার হৃদয় জয় করেছিলে। কয়েক বছর তাকে সময় দিয়েছিলে প্রতিষ্ঠিত হবার। সে কিছুটা প্রতিষ্ঠিতও হয়েছিল। কিন্তু তুমি···হ্যাঁ তুমিই কথা রাখতে পারো নি।

—তার জন্যে কি আমি একা দায়ী? প্রলয়দা অন্যমেয়েদের নিয়ে নিজে মত্ত থাকবে আর আমি হবো তার যৌবনের

অভিসারিকা। হবো তার দেহ-বিলাসিনী? আমাকে উপভোগ করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে—এত বড় কথা বলার সাহস ও কোথা থেকে পেয়েছে সৌম্যদা? এই তোমাদের ভালবাসার আদর্শ? আমি অনেক উদাহরণ জানি, সেজন্যেই আজ চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমাকে নিয়ে এই একশো কুড়ি টাকা আয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে কি খাওয়াবে বলতে পারো? সরকারী অফিসের বেয়ারা হবে আমার স্বামী? লোকের কাছে কি পরিচয় দেবো? ওদের বংশের পরিচয় দেওয়ার মতো কে আছে? দারিদ্র্য দরজা দিয়ে এলে প্রেম জানালা দিয়ে পালিয়ে যায় সৌম্যদা। আমি আগে এত কিছু বুঝতাম না; আজ সব বুঝতে পারছি ও আমার কি ক্ষতি করেছে। আমি ওর অনেক করেছি। অনেক করেছি।

—এমনি এক রাতে ট্রয়ের রাজকুমার ট্রয়িলাস দুর্গ প্রাচীরে আরোহন করে তার ভালবাসার পূর্ণ তপ্ত দীর্ঘশ্বাস পাঠিয়েছিল গ্রীক শিবিরের দিকে। সেখানে নিদ্রিত ছিল তার হৃদয়ের রাণী ক্র্যাসিডা। প্রলয়ের দীর্ঘশ্বাস কত পড়ছে বলতো! আমার ওপরে তার কি পরিমাণ ক্ষোভ আর অভিমান জন্মাচ্ছে ভাবতে পারো! গ্রীকরা ক্র্যাসিডাকে কেড়ে নিয়ে গেলে ট্রয়িলাস যা করেছিল আজও এই পূর্ণিমার পবিত্র রাতে প্রলয় বোধ হয় তাই করছে। ফুলশয্যার এমনি এক পবিত্র রাতের স্বপ্ন দেখেছিল প্যারিস। কিন্তু তারও সে আশা চরিতার্থ হয় নি। প্রলয়ের সঙ্গে রোমিও-জুলিয়েট দেখার সময় এই দৃশ্য মনে দাগ কাটে নি?

বন্যা অন্য কথায় কান না দিয়ে বলে: এরা সত্যকার প্রেমিক সৌম্যদা। তাই গ্রীক পুরাণে আজও এরা অমর হয়ে আছে। কিন্তু আজকের দিনের ছেলেদের প্রকৃত ভালবাসা বলতে কিছু নেই। ওটা যৌবনের মোহ, উপভোগের লালসা মাত্র। তাহলে তাদের বহু নারী সঙ্গ আর হতো না। সে যেমন অভিনয় করেছে আমি তেমন করে এসেছি। বিবেকের কাছে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তোমার মতো তার যদি সেই আদর্শ থাকতো তাহলে এই সমুদ্র-সৈকতে আমি ভিডোর মতো উইলো ডাল হাতে নিয়ে

প্রলয়দার জন্যে আকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করতাম। অথবা মিডিয়ার মতো তাকে চিরযৌবনসিক্ত করে আমার হৃদয়-কন্দরে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতাম।

সৌমেন্দু উদাসভাবে চেয়ে বলে: কিন্তু আমি কি করবো ভাবতে পারছি না। দিন দিন আমি ভীষণ দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। তুমি আমাকে ··অক্টোপাসের মতো আমার মনকে ঘিরে ফেলছো।

বন্যা সৌমেন্দুর হাতটা নিজের উত্তপ্ত বুকে চেপে ধরে বলে: আজ কথা দাও।

সৌমেন্দু বন্যার দিকে নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে থাকে। মুখে কথা নেই। বন্যা সৌমেন্দুর আরোও কাছে আসে। বলে—কথা দাও।

—দিচ্ছি।

* * * *

অফিস যাবো। বন্যা রান্না করে আজই প্রথম খুব তৃপ্তিভরে খাওয়ালো। কাপড়ের আঁচল দিয়ে আমার মুখ আর হাত মুছিয়ে দিলো। আমার জুতো পালিশ করে দিয়েছে। টাই বেঁধে দিয়েছে। ভাবলাম বিয়ে না করেও স্ত্রীর আদর-যত্ন ক'দিন খেয়ে নিই। তারপর কোথাকার জল কোথায় গড়ায় দেখি। বন্যাকে আদর করে ঘর থেকে বেরুবো এমন সময় পিয়ন এসে বলে: বাবু, এক্সপ্রেস চিঠি। একে দেরি হয়ে গিয়েছে, তার ওপরে প্রলয়ের চিঠি পেয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

সৌমেন্দুদা,

মুক্তিবাবুর মুখে আপনার কথা শুনে, বিদ্যাশিক্ষার পরিচয় পেয়ে, আপনার সঙ্গে আলাপ করে সেদিন অপার শ্রদ্ধা আর ভক্তি জন্মেছিল আমার মনে। আজ এই মুহূর্তে আপনার প্রতি জেগেছে আমার অপার ঘৃণা, অবিমিশ্র ঘৃণা, এত ঘৃণা এর আগে বোধ হয় আর কাউকে করি নি। জানেন সৌমেন্দুদা, অশিক্ষিত মানুষের স্বরূপ সহজে ধরা যায়। আপনারা শিক্ষিত বলে অহঙ্কার করেন অথচ সমাজের আপনারাই সবচেয়ে বড় ঘাতক, বর্ণচোরা। আজ আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আপনি

পালালেন ; কিন্তু ওকে নিয়ে আপনি সুখ পাবেন? আপনাকে উদারপন্থী বলে জানতাম। এতখানি সংকীর্ণমনা, নীচ, ভীরু, কাপুরুষ হবেন এ আমার স্বপ্নের বাইরে ছিল। আপনি, শুনতাম সঙ্গীতের পূজারী, সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের তর্পণ করেন। আজ মনে হয় আপনার সবটাই সাজানো ব্যাপার। সংসারের রঙ্গমঞ্চে আপনি একজন দক্ষ অভিজ্ঞ অভিনেতা। কিন্তু যাকে নিয়ে অভিনয় করছেন দেখবেন আপনার অভিনেত্রী আপনার পাশে কতদিন থাকে। দিন কয়েকের মোহ বই নয়।

ছোট ভাই হিসেবে আপনাকে আর কি বা বলবো। আপনি ওকে নিয়ে সুখী হোন। শুধু ভাবি ন্যাকামি করে এত বাহারে ভাষার ফুলঝুরি জ্বালিয়ে চিঠি না লিখলেই ভাল করতেন। নিজের ভুল নিজে সব সময় বুঝতে পারে না। অন্যের প্রয়োজন হয়। আপনার আজকের এই অন্যায় কাজকে সমাজ কোন চোখে নেবে তা জানি না। তবে আপনার সুনামের ওপরে একটা কলঙ্কের বোঝা চাপবে এতে সন্দেহ নেই। প্রেসের ওপরেও হামলা হয়ে গেছে শুনেছি। বন্যাদের বাড়িতেও পুলিশ পোষ্টিং হয়েছে। কিছু কিছু বিরুদ্ধ মতের পোষ্টার আপনার পাড়ায় দেখলাম। আপনার মা-ও শুনলাম কান্নাকাটি করছেন। এতগুলো ঘটনার কথা জানালাম ছোট ভাই হিসেবে। নিজের কাজটা কতটা শোভনীয় হয়েছে একবার বিচার করে দেখবেন। আমার আর কি আছে বলুন। প্রথমবার যাকে ভালবাসতাম সে বিট্রে করলো। সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলাম। সেই থাকলেই ভাল হত। বন্যা আমাকে সংসার-মুখী করলো, কিছুদিন খেলালো আবার সে-ই নিজের সুখ-সমৃদ্ধির প্রলোভনে আপনার সঙ্গে পালালো। ভাগ্যটাই খারাপ সৌমেন্দু দা। ঠিক এই মুহূর্তে আর আপনাকে কি লিখবো ভাবতে পারছি না। মনের গ্লানি, ক্ষোভ কিছুটা লিখে হালকা করলাম মাত্র। ভবের হাটে আর কত দেখবো তাই ভাবি।

আপনার চেনা জানা প্রতিদ্বন্দ্বী,

প্রলয়

চিঠিটা পড়ে বন্যার বিছানার ওপরে শুয়ে পড়লাম। ওর তখনও পড়া শেষ হয়নি। বললাম : এরপর তুমি যা বলবে তাই করবো, বন্যা।

—সৌম্যদা, তুমি প্রায়ই বলতে লোকে যে যা বলে বলুক, ঠিক পথে থাকলেই হল। তোমার সেদিনের আদর্শ আজ আর একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। আমি যে নিজেই চলে এসেছি একথা তো যেদিন আসি সেদিন সকালেই প্রলয়দাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে এসেছি। তাহলে আপনার ওপরে এত ক্ষোভের কি আছে ?

—আজকে এত বড় একটা কেলেঙ্কারী হতে চলেছে এর মূল কোথায় জানো ? তোমার বাবা-মা ; তারা যদি তোমাকে প্রথমে প্রলয়ের সঙ্গে এত গভীরভাবে মিশতে না দিতেন এত সমস্যা আজকে দেখা দিত না। তুমি কোথায় কি করছ তোমার বাবা-মা কি জানতেন না ? তবে তারা বাধা দেননি কেন ? আর যদি সমর্থনই করেছেন তবে তোমাকে তার হাতে তুলে দেয়নি কেন ? সৌমেন্দুর টাকা আছে, সে প্রতিষ্ঠিত ছেলে বলেই তার সঙ্গে পালিয়ে আসতে হবে ? ছিঃ ! ছিঃ ! এই তোমাদের আদর্শ ? প্রলয়ের সামান্যতম দোষ নেই। অযথা ছেলেটাকে দোষারোপ করো না। রাগের মাথায় ও আমার ক্ষতি করেছে সত্য, কিন্তু চিন্তা করে দেখো তো, ও ইয়ং ছেলে, রক্ত মাংসের মানুষ। ওর ওপরে সব দোষটা চাপিয়ে দেবো কি করে ? আমাদের দুঃখ হলে, মনের ক্ষোভ হলে আমরা গান গাই, লিখি, ওরা এতটা উন্নত মনের মানুষ নয় তাই আমার প্রেস পুড়িয়ে দিয়ে হয়ত উন্মত্ত উল্লাসে মেতে উঠেছে ; কিন্তু এটা খুব একটা দোষের বলে আমার সুস্থ মাথা সায় দেয় না। বন্যা আমার একটা অনুরোধ রাখবে ? হাতে ধরে বলো।

সহাস্যে সোহাগে : বলোই না।

—তুমি প্রলয়দাকে বিয়ে করো। সুখী হবে। ও আরও প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি সেই স্বপ্নই এতদিন দেখে এসেছি বন্যা।

আমার অনুরোধ রাখো। তোমার অনেক মঙ্গল হবে।

খুব গম্ভীর হয়ে: তাহ'লে তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও? এ জন্যই সব সময় আলাদা থাকতে চাইছ। তাই যদি তোমার মনে হয়ে থাকে স্পষ্টই বলে দাও আমি এক কাপড়ে এখুনিই বেরিয়ে যাচ্ছি। তুমি এত বড় কাপুরুষ তা জানতাম না।

—কোথায় যাবে?

—সেটুকু তোমার জানার প্রয়োজন নেই।

—আমার সঙ্গে তো এসেছ। আছো। এটা তো সকলেই জানে; অন্তত আমার চিঠিতে আমি তাই জানিয়েছি। এখন কোথায় যাবে জানালে তাদের জানাতে পারবো।

দেখলাম বন্যা কাঁদতে কাঁদতে কাপড় নিয়ে বাইয়ে যাবার জন্যে উদ্যত। আমি বাধা দিয়ে বললাম—ছেলে-মানুষী করো না। তুমি এতদিন জীবনটাকে উৎসব বলে জানতে। তাই যতটা পেরেছ উপভোগ করে নিয়েছ। এখন সেখানে আর শ্রোতা নেই। গায়ক তার করুণ স্মৃতি স্মরণ করে হা-হুতাশ করছে। সন্ন্যাসী হতে চায়। জীবনটা এত রোমান্সে ভরা নয় বন্যা। তোমার আর আমার মায়ের চিঠি আসুক তারপর একটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে। চুপচাপ বসো। আজকের অফিসটা গেল। নতুন চাকুরী। জেনাল ম্যানেজার অবাঙালী।' আমার অবস্থাটা তুমি বুঝতে পারবে না বন্যা—কি এক অসহায় অবস্থায় আমি দিন কাটাচ্ছি। দিনে রাতে ঘুম নেই। খাই না। আজই প্রথম ভাল করে খেয়েছি। শুনেছিলাম তুমি নাকি রাঁধতে পারতে না। আজ দেখলাম সে ধারণা মিথ্যে। তুমি অনেক কাজ শিখেছ।

কথা কেড়ে বন্যা: আর তবু আমি তোমার স্ত্রী হবার অযোগ্য!

ওর কথায় কান না দিয়ে: চলো একটু ঘুরে আসি। মন্দিরের দিকে চলো।

*　*　*　*

বাইরের এক ফালি তাজা রোদ এসে পড়েছে ঐ নেমপ্লেটের

গায়। ঔজ্জ্বল্য আরও বেড়ে গেছে। অনেক পথের পরিশ্রম করে বৃদ্ধা আর তার ছেলে এসে হাজির হয়েছে এখানে : সৌমেন্দু রায়, পি. আর. ও. সুন্দরী কেমিক্যালস্, পুরী ব্রাঞ্চ অফিস। মনে বিরাট তৃপ্তি, কিন্তু তালাবন্ধ। পাশের বাঙালী ভদ্রমহিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে : আচ্ছা, পাশের ঐ ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা কোথায় গেছে জানেন ?

—ঠিক বলতে পারি না। তবে কিছুক্ষণ আগে কাপড় পরা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল। শুনেছিলাম ভদ্রমহিলা যখন কাপড় পরেন তখন একজনকে ধরতে হয়। তা ভদ্রলোক ভারী ভাল মানুষ। উনি রাজি হননি। আমার ঐ বয়টাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা দু'হাতে খান, এজন্যে রায়বাবু বেশ ধমক দিয়েই কথা বলছিলেন। আচ্ছা ওনাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে ? মেয়েটা খুব আলট্রামডার্ণ বলে মনে হয়। পোষাকে বড় বেশি বিদেশী প্রভাব। সিঁদুর পর্যন্ত পরে না।

—কোন দিকে ঠিক গেছে বলতে পারেন ? অনেক দূর থেকে আসছি। বড় ক্লান্ত।

—আমার ঘরে আসুন। ফ্যানটা খুলে দিচ্ছি। ওরা এলেই চলে যাবেন।

—আপনারা কতদিন এখানে আছেন ?

—তা' বছর খানেক হবে। এর আগে আমরা এই কেমি-ক্যালস-এর আসাম শাখায় ছিলাম—গৌহাটীতে। আপনারা বাংলার কোথায় থাকেন ? কলকাতায় কি ? এরা কি আপনার আত্মীয় ?

—আচ্ছা বলতে পারেন, ওরা কি রান্না করে খায় ? এমন সময় তালাবন্ধ···মানে হোটেলে যেতে পারে তো।

—আজ মনে হয় হয়েছে। বয়টা ঐরকমই বলছিল।

—ওরা খুব সুখী বলে মনে হয় ?

—কি জানি দিদি, বুঝি না। ভদ্রলোককে খুবি বিমর্ষ লাগে। খেয়ালী, আত্মভোলা, স্ত্রী···বেশ মডার্ণ। সবই বিদেশী কায়দায়

চালচলন। সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরোয়। ফেরে অনেক রাতে। বারোটাও হয়ে যায়। সকালে ওঠে ন'টার পর। সিঁদুর, শাখা, নোয়া তো অঙ্গে দেখিনি। কারো সঙ্গে কথা বলে না। দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আপনি কি সৌমেন্দুবাবুর মা?

—শুনি বিদেশ-বিভুঁই-এ বাঙালীরা ভীষণ একতাপ্রিয়। আপনারা আছেন নিজের বোনের মতো ওকে একটু দেখবেন। ও আমার খুব আদরের। বাড়িতে কিছুই করে না। সন্ধ্যে দেয় না; শাঁখ বাজাতে পর্যন্ত জানে না। খাবার সময় মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে দিতে হয়। মুখ ধুইয়ে দিতে হয়। সে মেয়ে একা কি করে সংসার করবে বলুন। ঝি-চাকর কি সৌমেন্দু রাখেনি? এতো খু-বি অন্যায়। না, না, এভাবে মেয়েটার ভীষণ কষ্টে দিন কাটছে। সৌমেন্দু আসুক আজ একটা বোঝাপড়া হবে।

—এতো চিন্তিত হবার কিছু নেই দিদি। আমি তো পাশেই আছি। কলকাতার কোথায় থাকেন আপনারা?

—বালিগঞ্জ লেকের কাছে। ওখানকার আমরা স্থায়ী বাসিন্দা। আমরা কারবারী মানুষ। সংসারে টাকা-পয়সাকেই বড় বলে মনে করি। সৌমেন্দু ঠিক উল্টো ভাবে। স্থূল জীবনের প্রতি তার তুচ্ছ আকর্ষণ কোনোদিন দেখিনি। কলকাতার জনবহুল জনজীবনকে ও ভাল চোখে নেয় না। একটু নির্জনতা পছন্দ করে। তাছাড়া···কিছুটা কালচারড্ সোসাইটিতে মেশা অভ্যেস তো! হয়ত এখানে ওদের উপযুক্ত কাউকে পাচ্ছে না; সেজন্যই বোধ হয়···একটু দূরে থাকে।

কথা চলছে এমন সময় ট্যাক্সি এল। সৌমেন্দু নেমে ভাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকবে এমন সময় হাতটা ধরে: আমি কালই চিঠি পেয়েছি। চলো ঘরে। অনেক কথা আছে।

পাশ থেকে ভাইকে দেখে বল্লা: অমরনাথ, পাঁচটা ভারী সুন্দর শাড়ি কিনেছি। তিনটে আমার পছন্দে আর দুটো সৌম্য-দার। অবশ্য ও দুটো প্রেজেন্ট করেছে। ভারী সুন্দর পছন্দ ওর। দেখ একবার, ঠিক কলকাতার মতো শাড়ি।

কাকীমা একটু বিরক্তিবোধ করে: তোর ঘর-সংসার হতে চলেছে এখনও শাড়ির মায়া গেল না। চল, ঘরে চল। কিছু খাবার-দাবার আছে তো! অমরের আবার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

অমরকে নিয়ে বাইরে যায় সৌমেন্দু। ঘরে কোথায় কি আছে তা ভাল করে নিরীক্ষণ করে কাকীমা বিস্ময়ে বলেন: বন্যা দুটো বিছানা কেন? তোরা পৃথক থাকিস্? তুই আজও ভীষণ বোকা রয়ে গেলি। ছেলেদের ভোলাতে মেয়েদের বেশি সময় লাগে না। তোর এত সুন্দর দেহলাবণ্য থেকেও তু··ই···

—তুমি ওকে চেনো না মা। ও এত তুচ্ছ মোহে ভোলবার পাত্র নয়, আমি গত রাত্রে কত রকমের মোহজাল বিস্তার করে বিয়ের সম্মতি আদায় করেছি তা তুমি ভাবতে পারবে না। সৌম্যদার মতো ছেলেও নিষ্পলক চোখে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে অনুকরণ করেছে। কালকের ফুলশয্যার রাতে সৌম্যদা আমার কাছে প্রথম পরাজয় স্বীকার করে আমারই পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছিল। সারাটা রাত নানান ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। দেখলাম আমাদের কাছে মহাদেবের মতো চরিত্রও টলে যায়। জানো, সব ঠিক ছিল হঠাৎ প্রলয়দার চিঠি যত কাল করলো। সৌম্যদা আবার বেঁকে বসেছে। আবার আদর্শের দোহাই দিয়ে দূরে সরে থাকতে চাইছে।

—শোন, একটা বেড বাইরের ঘরে থাকবে। আর একটা খুব ভাল করে সাজিয়ে রাখ। সৌমেন্দু আপত্তি করলে বলবি, মা এসেছে কোথায় থাকবে বলো। আর আমি ওকে ভাল করে বোঝাচ্ছি। আজই তোদের জগন্নাথের সামনে দু'হাত মিলিয়ে দেবো। এর পরের দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার। ওকে ভুলিয়ে রাখতে হবে। অন্তত ক'টা দিন। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

সৌমেন্দু অমরকে নিয়ে ফেরে। রান্না ঘরে বন্যা আর ভাই চলে যায়। সৌমেন্দুকে নিয়ে কাকীমা বাইরের ঘরে বসে। নানান গল্পের অবতারণা হল। কেমন লাগছে চাকুরী, এখানকার খাওয়া-দাওয়া, পরিবেশ ইত্যাদির কথা শেষে বললেন: শুনলাম বন্যু নাকি

খুব আদর যত্ন করে তোমাকে খাওয়াচ্ছে। তা বাবা তুমিতো জানো বাড়িতে ও কুটি ভেঙে দু' টুকরো করে না ; এখানে তোমার পাল্লায় পড়ে বেশ কাজ শিখে গেছে। শোনো, এখন যখন অনেকদিন এখানে থাকতে হবে তখন একটা রাতদিনের লোক রাখো। সে ভারী কাজগুলো করবে। একেবারে এত পরিশ্রম ওর আবার শরীরে সইলে বাঁচি। শোনো, এ পাড়ায় তোমাদের নামে অনেক কানাঘুষা শুনলাম। একই সঙ্গে থাকো, ঘুরে বেড়াচ্ছ দু'জনে, অথচ বন্যা সিঁদুর পরবে না, হাতে শাঁখা থাকবে না, এটা কি ঠিক ? এখন তো আর আমি বলতে পারি না। ও তোমার মনের মানুষ। তোমার কথা ও মেনে চলবে। যে পথে গেলে তোমাদের মঙ্গল হয় তাই কর বাবা। তবে তোমরা সংসার জীবনে নতুন বলে অভিজ্ঞতা কম। পড়সীদের কথায় কান না দিলেও সমাজ বলে তো একটা জিনিস আছে, আচার, সংস্কার আছে। সংসার করলে ওসব মানতে হয়। আনমনে চেয়ে : ধর, তুমি যদি……আজই ঠাকুরের সামনে ওর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দাও, তাতে আপত্তি আছে ? আমি শাঁখাটা পরিয়ে আনবো। ভেবে দেখেছো, এক সঙ্গে রাতদিন থাকছো, সমাজের চোখে এটা ঠিক নয় বাবা ; একটু চিন্তা করে দেখো। তোমার বিদ্যাশিক্ষা আছে আমি তোমার ব্যক্তিত্বের ওপরে হাত দিতে চাই না। শুধু সংস্কারের কথা বললাম। গোধূলী লগ্নে এ কাজটা করলে হয়ত আপত্তি থাকবে না।

—কিন্তু আমি কি করছি, কোন্ পথে চলেছি তা আজও ঠিক বুঝতে পারছি না। বন্যা জোর করে অনেক বাজে কাজ করাচ্ছে। আমার সম্মতি নেই তবু করছি। কেন করছি তা জানি না। আমি এত দুর্বল মনের মানুষ ছিলাম না। গত রাতে ওর বিক্ষুব্ধ হৃদয় হঠাৎ ফুলশয্যার কথা বলে কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠল। তারপর আমাকে নিয়ে কত অসংযত কাজ জোর করে করালো তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এর পরেও আপত্তি থাকতো না যদি আমার মায়ের চিঠিটা পেতাম। মায়ের সম্মতি

না নিয়ে ওকে আইনগত ধর্মপত্নী করতে পারছি না। এ আমার বিবেকের প্রশ্ন। আশা করি, এতে আপনি হাত দেবেন না। ভেবে দেখুন তো আমি মায়ের একমাত্র সন্তান, অথচ আমার বিয়ের কথা মা জানবে না, এ ঠিক নয়। ছেলে হয়ে এত বড় অপরাধ আমি করবো কি করে? এতে আমার অনেক বড় অকল্যাণ হবে। না, না, এ আমি পারি না। আমি পারি না। আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন। মায়ের চিঠি আসবে। তারপর একটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে।

—কিন্তু যত দিন যাবে সমাজে তোমাদের স্থান কোথায় যাবে ভাবতে পারো। আমি তোমার সেই আত্মসম্মানের কথা ভেবেই এত সব কথা বললাম। আচ্ছা ধরো, আজকে আমার কথাটা রাখলে, তারপর আমি বাড় ফিরেই তোমার মায়ের সম্মতি নিয়ে যদি চিঠি লিখি···তাহলেও তো একই কথা হল। তোমার মা যা তোমাকে ভালবাসে তাতে তোমার এই কাজকে সমর্থন করবেন না···বলে মনে হয় না। তাছাড়া বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যে তুমি দীর্ঘ চার বছর ধরে কি সংগ্রাম করেছ আজ সামান্য একটা বাধাতে সরে যাবে—সে কি তুমি চাও? একটা মূল্যবান জীবন—যার জন্যে তুমি তোমার জীবনের সেরা চারটে বছর নষ্ট করলে তার জন্যে আর সামান্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না?

—আমি ওকে বাঁচাতে গিয়েছি আমার নিজের জন্যে নয় কাকীমা, ওরই ভবিষ্যতের জন্যে। ওর ওপরে তুচ্ছ লোভ আজও আমার নেই। ওর সঙ্গে এখানে এই ক'দিন থেকে আমি হয়ত কিছুটা দুর্বলতার পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু এটাই আমার স্বাভাবিক প্রকাশ নয়। অনেকটা সমস্যার চাপে পড়ে বাধ্য হয়েছি। আর একটা দিন সময় দিন আমি শেষ সিদ্ধান্ত নেবো। আপনি আর একটা দিন তাহলে থেকে যান।

* * * *

বিকেল হয়ে আসছে। অমরকে নিয়ে শুয়ে আছি। রোদ পড়লে মন্দিরের দিকে বেড়াতে যাবো। বন্ধুর আদেশ। নতুন

গিন্নীর কথা ফেলা যাবে না। রাতে রান্না হবে কিনা জানি না। বাড়িতে জীবনে রেশন-বাজার কোনোদিন করিনি। এখানে সব করতে হচ্ছে। এত কষ্ট, ঝামেলা ভোগ করেও মানুষ সংসারী হয়, সংসারের নামে সঙ সাজে। আমি না হয় চাপে পড়ে করছি অন্য অনেকে তো স্বেচ্ছায় করে। নানান এলোমেলো চিন্তা করছি। এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দ: এক্সপ্রেস। উঠে গেলাম। মার চিঠি।

স্নেহের সৌম্য,

তোমার মানসিক দুশ্চিন্তা নিরসনের জন্যে চিঠি পাওয়া মাত্র আমার মতামত জানালাম। এর মাঝে অবশ্য এ বাড়িতে লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেছে। তা এসে শুনবে। মুক্তিবাবুর পাড়ার তপন গতকাল আমার কাছে এসেছিল। ওর কাছে ব্যাপারটা ভাল করে শুনলাম। বিদ্বান, চরিত্রবান, গুণবান ছেলে এ জগতে খুব কম আছে। আমি এতদিন সেই দুর্লভ সম্মানে সম্মানিত ছিলাম। আজও আছি কিনা তা তুমি জানো। তুমি যে সমস্যায় পড়েছ তাতে তোমার ত্যাগ স্বীকার ছাড়া পথ নেই। আমার আপত্তি নেই। তবে বিয়েটা এখানে হলেই আমি বেশি তৃপ্তি ও আনন্দ পাবো। আমার আত্মীয়-স্বজন, লোক-লৌকিকতা সবই আছে। একটা মাত্র ছেলের কাজ আমি কাউকে না জানিয়ে করতে পারবো না। তুমি বন্যাকে বুঝিয়ে বলো। আর অফিসের একমাস ছুটি নিয়ে এসো। আমি এখানে সব ব্যবস্থা করছি।

আমার কথা রাখলে সুখী হবো।

তোমার 'মা'

চিঠিটা পড়ে বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়লাম। বন্যা পিওনের গলা পেয়ে ছুটে এসে: মা কি লিখেছে, কই দেখি। আমি হ্যাঁ বা না কোনো উত্তর না দিয়ে শুয়ে থাকি। আমাকে ধাক্কাধাক্কি শুরু করতে চিঠিটা হাতে দিয়ে: বউ হবার খুব সখ। এতো সেজেছ কেন? বিয়ে তোমাকে আমি করছি না। যত সব বাজে মেয়ের পাল্লায় পড়ে উৎসন্নে গেলাম। হাতটা ধরে পাশে বসালাম।

বললাম : পিঠে একটু পাউডার মাখিয়ে দাও তো! বড্ড বেশি ঘেমে গেছি।

বন্যা খুব সোহাগ ভরে তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছিয়ে পাউডার মাখিয়ে পিঠের ওপরে মুখটা রেখে হেসে : মা-ও রাজি! আর কি যাবে কোথায়! আজ—যে ধুতিটা সেদিন কিনে এনেছি, আর ঐ বুটি দেওয়া পাঞ্জাবী পরে চলো। মন্দিরে যাবো। খুব ঘুরবো। প্রাণ···ভরে।

—আচ্ছা, আজকে ঘরদোরের পরিবর্তন দেখলাম। কি ব্যাপার বল তো?

—কিছু নয়। মা এসেছে বলে ওদের বাইরের ঘরে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমাদের ঘরে ওরা কি করে থাকবে?

—কেন?

বন্যা ধমকের সুরে বলে—ওসব বাচ্ছা ছেলের মতো কথা বলো না। যা বলছি তাই শোনো। এখুনি জামা কাপড় পরে নাও। চিঠিটা মাকে দেখাই। যাবে কোথায়? চারদিক থেকে ঘেরা আছে।

ও মায়ের কাছে গেল। বেশ হাসির রব শোনা গেল। সন্ধ্যায় মন্দিরে এসে কাকীমা জানালেন : অগ্নিদেবকে সাক্ষী করে আজ বিয়ের প্রাথমিক কাজটা শেষ করে রাখি। তারপর ঘরে গিয়ে কুশণ্ডিকা করা যাবে। দিনটা আজ খুব ভাল। আর তোমরা যখন দু'জনা রাজি আছ, তখন অযথা দেরি করে লাভ কি?

আমি মায়ের কথা ভাবি। ছোটবেলা থেকে যে সংগ্রাম করে আমাকে মানুষ করে তুলেছেন আজ এভাবে বিয়ে—তাঁর সম্মতি থাকলেও আমার বিবেক সায় দেয় না। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। সংসারী লোকের মতো দিন-রাত কাটছে আর আচার-অনুষ্ঠান না করে লাভ নেই। কাকীমা চান, মারও অমত নেই। এখন কি হয় দেখি।

আমরা বসলাম মুখোমুখি। হাত আমাদের ঘটের ওপরে

রেখে বাঁধা হল। হোমের কাঠ জ্বালিয়ে হোম শুরু হল। ঘি পুড়তে লাগল। শেষে মালাবদল হল। আমরা পুরোহিতকে প্রণাম করলাম।

বাড়িতে আমার ঘরে বইয়ের রাজত্বের মধ্যে একাই থাকতাম। এখানে ঘুমাতে পারছি না। বন্যার এতখানি উচ্ছ্বাস আর আবেগ ঠিক ভাল লাগছে না। তাই চোখটা বুজিয়ে ঘুমের ভাণ করে নাক ডাকাতে শুরু করলাম। আমার হাতটা নিয়ে বন্যা কখনও বুকে ধরে আবার রেগে বলে: এ বোকা লোককে নিয়ে সংসারের সুখ নেই।

আমি ঘুমের ঘোরে বলি: আর ক'টা দিন অপেক্ষা কর। সুখী হবে। আগে মায়ের উপস্থিতিতে বিয়ে হোক। আমার হাতের সিঁদুর তোমার কপালে পড়ুক। চক্ চক্ করে উঠুক তোমার কপোল রেখা। তারপর···

আমার কথায় কর্ণপাত না করে সংসারী লোকের মত আবেগে বন্যা জড়িয়ে ধরে।

[৭]

পুরী থেকে ফিরে দুটো দিন ঘুমিয়ে কাটালাম। প্রেসের রাশি খানেক কাজ জমা ছিল, তাও সেরে ফেললাম। আমার বিয়ের খবরটা খুব তাড়াতাড়ি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বাইরে বেরুতে ইদানিং কিছুটা সঙ্কোচবোধ করতাম। প্রেসের সাজসজ্জা পাল্টে গেছে। নতুন ম্যানেজার তাকে নতুন রূপ দিয়েছে। প্রেসের মালিকের বিয়ে। ট্রিপল ইম্প্রেসন দিয়ে বিয়ের কার্ডও দেখি প্রেসে ছাপা হয়ে পড়ে আছে। বাড়ির পুরোহিত সুধীরকাকুও এসেছেন। মায়ের সঙ্গে কথায় মত্ত। নাপিতখুড়ো আর করালী বৌদি পোকা-খেকো পান চিবানো দাঁত দিয়ে ক'দিন পুতনার হাসিতে মাতিয়ে রেখেছে। ছাদে বাঁশ বাঁধা হয়ে গেছে। প্রেসেই বসে সময় কাটছে আর নিজের কাজকর্ম করছি। গান আবার

ধরেছি। বাসরে গাইতে হবে তো! মামীমা প্রেসে এসে বলেন : সমু, দুধে আলতা রঙের বেনারসী কিনেছি। বন্যা ফর্সা শুনেছি। ওর কি রঙ পছন্দ বলতে পারিস্? আমি নবকে ডেকে বললাম : যা ভাই একবার ওদের বাড়ি। বলবি কি রঙের বেনারসী ওর পছন্দ হয় লিখে জানাতে, না হয় মুখে বলতে। আমার কথা শুনে নব : আবার ও বাড়িতে সৌম্যদা! রাগলে মেয়েটার জ্ঞান থাকে না। মেয়েটার সাহস জানেন, বলে —লাঠি দিয়ে তোর ঠ্যাং ভেঙে দেবো!

পাশে বিশু ছিল। সে বলে : আর ওসব কথা নয়। বন্যাদি আমাদের বৌদি হচ্ছেন। তার সম্পর্কে বাজে কথা বলিস্ না। গতস্য শোচনা নাস্তি। বিয়ের আগে অনেকে অনেক কথা বলে। ওসব মনে রাখতে নেই।

নব কোনো কথায় কান না দিয়ে : ভগ্‌বানকা মালুম! আমি সাফ কথা বলি। এতে মালিক রাগলে আমার কি আসে-যায়।

আমি বললাম : আচ্ছা, তোর বৌদি আসুক, রাতে তার কান মুলে দেবো। হবে তো?

মাঝে বরুণদাও এলেন। জামা, আংটি, বোতাম—সবের মাপ নিয়ে গেলেন। শুনলাম ওদেরও কেনা-কাটা জোর কদমে চলছে। মেয়ের বিয়ে রক্ষে কালী পূজোর মত। এক রাতের ব্যাপার। কিন্তু আমার বাড়িতে একি এলাহী কাণ্ড! টাকার শ্রাদ্ধ। মার যত কিছু আছে সব কিছু খরচ করে ছেলের বিয়ে দেবে। হাতে আর মাত্র দুটো দিন। নেমন্তন্ন শেষ হয়েছে। নহবৎ এই কদিন ধরেই বাজছে। বিয়ের আগে-পরে এক হপ্তা বাজবে। নামকরা জ্যোতিষী এসেছেন। তিথি পণ দেখে পাথর কেনা হয়েছে। নাপিত, ব্রাহ্মণ এখন থেকে মেলা বসিয়ে দিয়েছে। ছাদের মেরাপে বিচিত্র বর্ণের আলোর সমারোহ। বাড়িটাকে দূর অন্ধকার রাতে শৈলনগরী সিমলার মতো মনে হয়। বাইরে রাবণের রাজসভার সাজে সজ্জিত মণ্ডপ। পেন্টিং-এ ঘরগুলো এত মসৃণ হয়েছে যে মশা মাছিদের আস্তানা পর্যন্ত উঠে গেছে। দিন-রাত পরিষ্কার হচ্ছে। অফিসের ম্যানেজার আসবে। নামকরা দেশী-বিদেশী

অফিসার আসবে। তাদের জন্যে পৃথক ব্যবস্থা হয়েছে। বিয়ের কার্ডও অনেক ভাষাতে ছাপা হয়েছে। অনেক রকম। এক মাস ছুটি। বিয়ের পরেই সিমলায় হনিমুনের ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়িতে নিকট-দূর সব রকমের আত্মীয়স্বজন হাজির হয়েছে। সকালে দুধ যোগাতে গোয়ালা আসে। সরকারী জলের গাড়ি আসে। গায়ে হলুদ যাবার জন্যে দুটো গাড়ি ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুক্তিবাবুর ছোট অঙ্গন আয়োজনে ভরে যাবে। বিয়ের দিন কাকীমার একটা চিঠি পেলাম: এতদিন পরে মুক্তিবাবুর প্রকৃত মুক্তি হল। কিন্তু মেয়ে চলে গেলে আমি কি নিয়ে, কাকে নিয়ে থাকবো বাবা? ক'দিন সেই চিন্তাই করছি। মুক্তিবাবু যা চেয়েছিল আজ তুমি তা পূরণ করতে যাচ্ছ। কালবৈশাখীর উদ্দাম ঝড়ের স্রোতে পুরোনো চিন্তার মেঘকে উড়িয়ে দাও। আমার আত্মীয়-স্বজন খুবি কম এসেছে। বেশি বলতে পারিনি বাবা। আমি দয়াময়ের কাছে কৃতজ্ঞ। সংসার-সাগরে আমার মতো অসহায় আর কেউ নেই। আমি কাচ ফেলে ঠিকই হীরা চিনেছি। দয়াময়ের কৃপায় আজকের দিনটা ভালভাবে কাটলেই বাঁচি।

বিয়ের দিন সকালে চিঠিটা পড়ে বেশ উৎসাহিত বোধ করলাম। অবশ্য কাকীমা এর আগে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এই ধরনের চিঠি দিতেন। ভাষা আর বর্ণনাচ্ছটা খুব সুন্দর থাকতো। এককালে চিঠি লেখার মধুর হাত ছিল শুনেছি। মেয়ের সুলেখার গুণ মাতৃসূত্রে পাওয়া। এক বাড়ি আত্মীয়ের সামনে উচ্ছ্বাস আর আবেগ সম্বরণ করে চিঠিটা না লিখলেই ভাল করতেন। এক বাড়ি লোকের অহেতুক আগ্রহ জাগতো না। চিঠিটা আসার সঙ্গে সঙ্গে পড়ার জন্যে কত অনুরোধ, অনুনয় আর অস্থিরতা অদ্ভুতভাবে বেড়ে গেল। কেউ কেউ আবার এটাকে বন্যার চিঠি বলেই চালাতে সুরু করেছে। বুড়িরা বিরূপ মন্তব্য করতে সুরু করেছে। সকলের কাছ থেকে পালিয়ে এসে প্রেসে এলাম। দেখলাম বন্ধুরা নাছোড়-বান্দা। বন্যা কি লিখেছে দেখবে। আমি কত বোঝালাম। ওটা ওর মায়ের—কেউ তা বুঝতে চায় না।

শীত কাল। ছোট বেলা। মেঘলা সকাল বেলা থেকেই ছিল। তার ওপরে অন্ধকার নামতে লাগল। বাড়িতে তিনটে থেকেই সমস্ত আলো-জ্বালা সুরু হলো। বিয়ের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। বিকেলে ঘুমের পর মায়ের ডাক পেলাম: আমার সঞ্চিত যা ছিল প্রায় সবই খরচ করে ফেলেছি। নাপিত, পুরুত, ম্যারাপ, আলো—সবেরই দাম মিটে গেছে। এই ক'দিনের জন্যে তুমি ব্যাঙ্ক থেকে আর হাজার পাঁচেক টাকা তুলে নাও। শোনো, বরযাত্রীর দুটো বাস যাবে। তার টাকা সকালে মিটিয়ে দিয়েছি। বরের গাড়িটা কলকাতা থেকে সাজিয়ে আনছি। তার টাকাও মেটানো আছে। বরের সঙ্গে তিনদল বাজনা যাবে তারও টাকা মেটানো আছে। মনে হয় ঐ টাকাতে চলে যাবে।

—কিন্তু এত টাকা···নষ্ট করে ··

—নষ্ট! ··তোমার বাবার বিয়ের সময়ে এ পাড়ার লোকেরা এক হপ্তা ধরে খেয়েছে। প্রতিদিন যা লোক খেয়েছে আমার বাপের বাড়িতে মচ্ছপেও তত লোক খেতে দেখিনি। আমাদের সে জমিজমা আজ নেই, সরকার সব নিয়ে নিয়েছে, আত্মীয়রা ফাঁকি দিয়েছে, তোমার বাবার অতি উগ্র ন্যায়বোধ আর সততার জন্যে অনেক সম্পত্তি হারাতে হয়েছে। তাই বলে তুমি কি ভিখারীর ছেলে যে নমঃ নমঃ করে বিয়ে হবে! এ বিয়ে তো পুরীতেই হতে পারত। কাক-পক্ষী জানতো না। টাকা লাগতো না। সেই ভাল হতো?

হঠাৎ প্রকৃতি তার সহাস্য পূর্ণ যৌবন নিয়ে একবার হেসে উঠল। তারপর করুণ বিষাদ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল। অন্ধকার আরও নামতে সুরু করল। কালো মেঘে ঢেকে গেল আকাশ। উঠল ঝড়। ম্যারাপ কাঁপতে লাগলো। আলোগুলো দুলতে লাগলো। কে যেন করুণ সুরে আর্তনাদ সুরু করলো: বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

সৌমেন্দু বিস্ময়বোধ করে বলে: মা, কে কাঁদছে বলতো? কেউ বোধ হয় মারা গেছে। শুনতে পাচ্ছো না ঐ করুণ আর্তনাদ?

কারো কি অসুখ করেছিল? মনে হয়, আমাদের কোনো চেনা লোক মারা গেছে। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। আমি···ভাল বুঝছি না।

সৌমেন্দু অচৈতন্য হয়ে পড়ে। জলের ছিটে চোখে মুখে দেওয়া হলো। ডাক্তার এলো। বন্ধুরা সেবায় রত। কেউ কেউ বলে: অত্যধিক মানসিক দুশ্চিন্তার জন্যই হয়েছে। ও ঠিক হয়ে যাবে।

পাশের ঘরে দিদিমা ছিলেন। তিনি এসে বলেন: বলি, বিয়েটা পুরীতে হলে কি ক্ষতি হতো বুঝি না। অনুষ্ঠানটা না হয় এখানে হতে পারত। আজকাল এই ফ্যাসানই তো চলছে। অযথা একটা ঝামেলা সমুর মা করে বসলো। ছেলে বড় হলে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হয়, তা তো ও করলো না, অধ্যাপক করবে। হাজার টাকা মাইনে হবে। তার···পর···বিয়ে। বলি ত্রিশ বছর তো হয়ে গেছে আর কবে বিয়ে হবে? ত্রিশ বছরে তো ছেলেরা বুড়ো হয়ে যায়। এই বয়সে আট-ন'টা ছেলে-মেয়ে হয়েছে আমার। তারপর এই সন্টু, নন্টু, ঝন্টু, মন্টু—ওরা হয়েছে। ছেলেটার জন্যে পই পই করে বললাম, আমার বোনঝির বোন রয়েছে, একটু না হয় খ্যাঁদা-বোঁচা, তাতে কি এসে যায়! পাঁচ হাজার পেতিস্ তো। কিন্তু···সমুর মা তাতে গররাজি। এবার বোঝ, ছেলে কোথায় কি করে বসেছে তার ল্যাটা সাম্‌লানোই দায়! অধ্যাপক হবে! মেয়ে-ছেলে পড়াবে। বলি বয়সটা যাবে কোথায়? সব সন্ন্যাসী সাজতে চায়। মেয়েদের ল্যাজের ঝাপটা খেয়ে তবে মনের-জাহাজ সংসার-সাগরে ভেড়াতে গেল। বিয়ের আগেই তো সব করে বসলি। একসঙ্গে রাত কাটালি। বিয়েটা লোক-দেখানো এখানে করতে গেলি কেন? লোক খাওয়ার আগে পর্যন্ত তোদের মাথায় তুলে রাখবে। গলা থেকে নেমে গেলে······আর?

পাশ থেকে কে যেন বলে: যাও, যাও, দিদিমা আর দাশু রায়ের পাঁচালী গাইতে হবে না। ক'দিন পেটে বেশ ভাল-মন্দ

পড়ছে তো, তার গদ্ যাবে কোথায়! মুসোলিনীর সময় হলে অনেক টাকা পেতে গো···অনেক টাকা পেতে!

—তা বটে! এখন ঐ মেয়েটার রাজত্ব কিনা, তা না হলে দেখ্‌তিস্! ওর বাবার আমলে একবার এই রকম একটা কথা শুনেছিলুম। তা কতদূর এগোলো বাবা!

দালানের এই হাসি-ঠাট্টার আসরে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে সমুর মা বলেন: ছেলেটা খাবি খাচ্ছে, আর তোরা কিনা রঙ্গ-রসিকতায় মেতে থাকবি? তোদের কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছুই নেই। যা ডাঃ হাজরাকে এখুনিই ডেকে আন। ও ভদ্রলোক সারাতে পারবে। যা···যা....দাঁড়াস্ না।

অচৈতন্য অবস্থা। ডাক্তার আর ওষুধ এলো অনেক। আনমনে সৌমেন্দু বকে যায়: আর বাঁচানো গেল না। আবার সেই পাঁকেই পড়ল। আমার চার বছরের সাধনা আজ ভস্মস্তূপে পরিণত হল। আমার মা-ও বুঝলো না। আমি কি আদর্শ নিয়ে এতদিন সংগ্রাম করে এসেছি। তাঁর কাছে আচার-অনুষ্ঠানই বড় হল। ভাগ্য আর ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারলো না। এত বড় অভিশাপ ওর জীবনে নেমে আসবে এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল। কি দুঃখ! কি দুর্বিষহ কষ্ট! পশুটা ওকে চিবিয়ে খেতে লাগল। ওর কঙ্কালটা পড়ে রইল। কুকুরে-শেয়ালে খেতে লাগল। কেউ দেখলো না। পতিতা আর ভিক্ষাবৃত্তি! অদৃষ্টের চরম পরিহাস! মা·· মা···

—আমি পাশে আছি বাবা। ও সব সেরে যাবে।

[৮]

চাঁদ উঠলো। হাসলো। লুকালো মেঘের গায় তারপর আলো-ছায়ার লুকোচুরি। চাঁদকে আর দেখা গেল না। লুকোচুরি নিয়েই জীবন-সংসার চলছে। হাসি-কান্নার সমারোহ সর্বত্র! কিন্তু যাকে নিয়ে আজকের নাটক জমে উঠেছে তাকে প্রত্যক্ষ রঙ্গমঞ্চে আনার কি প্রয়োজন ছিল। জোর করে নাটকের মুখ্য ভূমিকায়

মুক্তিবাবু যদি না নামাতেন আজ একটা নিরীহ জীবনে এতখানি সমস্যা দেখা দিত না। নানান এলোমেলো চিন্তার জাল আমার ঘরে বসে বুনে যাচ্ছি। এমন সময় শুনলাম আমার ডাক এসেছে। এ ডাক তো প্রতিক্ষণেই হচ্ছে। আমাকে নিয়ে যেন বাড়িসুদ্ধ মানুষের যত সমস্যা। বিয়ে প্রায় সকলেই করে কই এতো সমস্যা তো কারো হয় না। পর পর ডাক আসতে কিছুটা বিরক্ত হয়েই উঠলাম। শাঁখের আওয়াজ সুরু হল। ভাবলাম এত তাড়াতাড়ি বর আনতে আসবে, গভীর রাতে তো বিয়ে। ঘর থেকে দালানে আসছি দেখলাম বরুণদা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলেন, সৌম্যদা জরুরী বার্তা। একবার বাইরে চলো। বাড়িতে মুক্তিবাবুর স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখুনিই একবার আপনাকে দেখতে চায়। আপনি অসুস্থ শুনলাম। চলুন, চলুন বাইরে।

পাশেই মা ছিলেন : তা হয় না বরুণ। ও কিছুক্ষণ আগেও শুয়েছিল। আমি ওকে ঘর থেকে বেরুতে দেবো না। যা বলার এখানেই বলো। আর গোপন কিছু থাকলে অরুণকে বাইরে ডেকে বল। তাতে অসুবিধা হলে অন্যকে পাঠাতে পারি। সমু ঘরের বাইরে যাবে না—কোনোমতেই না।

—মাসীমা আপনাকে ঠিক ব্যাপারটাকে বোঝাতে পারবো না। তবে সৌম্যদা ছাড়া এ সমস্যা কেউ সমাধান করতে পারে না। পারবে না।

—কোনো আর্থিক সংকট? তার জন্যে আমি তো আছি।

—না, তাও নয়।

—তবে কি? ওকে নিয়ে আর ছেলে-খেলা আমি করতে দেবো না। ওর জীবনটাকে তোমরা নষ্ট করে দিলে। বিয়ের দিনেও প্রতারণা করতে চাও? তোমাদের এত সাহস কি করে হল তাই ভাবি। চলো, আমিই যাবো। ভদ্রমহিলাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। বড্ড বেশি বেড়ে উঠেছে।

—কিন্তু মুক্তিবাবুর স্ত্রী গোপনে সৌম্যদাকেই বলতে বলেছে। অন্য কেউ হলে হবে না।

—হবে না?···ওসব চালাকি আমি বুঝি। বলো ওকে আমি

যেতে দেবো না। গিয়ে বলবে একথা।

ইতিমধ্যে বাড়ির অনেক লোক এসে জমা হয়েছে। তারাও বরুণকে বোঝাতে যায়। কেউ কেউ বন্যার মার সম্পর্কে নানান বিরূপ, অশ্লীল মন্তব্য শুরু করে। সৌমেন্দু এতক্ষণ ব্যাপারটাকে খুব তুচ্ছভাবে নিয়েছিল। এবার বরুণদাকে একটু দূরে ঘরে বসিয়ে সৌমেন্দু: সত্যি করে বলুন আসল ব্যাপার কি ?

—মানে···মানে কিছু নয়—তেমন কিছু নয়।

—তবে ?

—হঠাৎ চিন্তাজনিত অবসাদে মাথাঘুরে পড়েছেন। কেটে গেছে কিছুটা। অবশ্য খুব বেশি দুশ্চিন্ত হবেন না। ডাক্তারবদ্দি আসে নি। আপনাকে একবার দেখতে চায়। কি সব কথা বলবে।

—কি আর বলার থাকতে পারে ? কারো কিছু হয়েছে ? বন্যার ? অনুনয়ের সুরে : শুনুন যদি টাকার দরকার থাকে বলুন, আমি দিচ্ছি। কাকীমা সে কথা বলেছেন ?

—না সৌম্য, তোমার কাকীমা কি সব বলবেন। তবে·· আমার মনে হয়, খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিশ্চয়ই। নইলে··

—আমি কিন্তু···ঠিক ভাল বুঝছি না। দেখুন, যে বাড়িতে আজ বিয়ে আমি তার কি অনিষ্ট, কি ক্ষতির চিন্তা করতে পারি। আর কি সম্ভব ? না···না··

—কিন্তু কয়েকটা কথার জন্যে একটা মানুষের অন্তিম আকূতি তৃপ্ত হবে না ? আপনাকে যে করেই হোক···

—মায়ের কথা ফেলতে পারবো না। অরুণই যাবে। আমি প্রতীক্ষা করে বসে আছি।

ঘরের আলো হঠাৎ নিভে গেল। গা ছম্‌ছম্‌। পেঁচার প্রাণভয়ে ভীতির আর্তনাদ। বাতাস বন্ধ হয়ে গুমোট হয়ে গেল। হাত-পা জ্বালা করতে লাগল। মাথা ঘুরতে থাকে। পায়ের ভারসাম্য ঠিক বজায় থাকে না। রাস্তার আলোও নিভে শ্মশানপুরী হয়ে যায়। হঠাৎ এক ঝড়ো হাওয়ায় বাইরের পরিবেশ পাল্‌টে

বিবর্ণ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ আকাশের গায়ে লক্ লক্ করে ওঠে। ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে পড়তে সুরু করল। মহাপ্রলয় এসে যেন আজ সব কিছুকে ধ্বংস করে দিতে চায়।

অরুণ আর বরুণ অন্ধকারের সেই করুণপথে চলেছে। মুক্তি বাবুর বাড়িটা অন্ধকার-পুরী। বাইরের রকে পুতুলের মতো লাঠি হাতে পুলিশ দুটো ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে বসে ঢুলছে। দু'জন তার পাশ দিয়ে চলে গেলেও তাদের খেয়াল নেই। খালি খাবার ঢেঁকি! সকাল-সন্ধ্যে গিলছে আর চোখ বুজিয়ে সমাজের সেবা করছে! একশো বার টাকা মাইনেতে ওরা কি বা করবে? ওদের ঐ চোখ-বুজে বসে থাকার মূল্যই দেড়শ টাকা। জেগে থাকার জন্যে আলাদা দামতো আর কেউ দেবে না। যাহোক গন্তব্যস্থলের গোপন রহস্য অজ্ঞাত রয়ে গেল। বরুণদার মুখে কোনো কথা নেই। সারা ঘর অন্ধকার। বেড-রুমে টেবিল আলো মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। মুখগুলো কালো ভূতের মতো করে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে। মুখে কারো কথা নেই। এমন অবস্থা এর আগে দেখা যায় নি। মুক্তিবাবুর স্ত্রী মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছেন। উসকো-খুসকো চুল। ছেলেটা মায়ের পায়ের কাছে মাথা রেখে ঢুলছে। মুক্তিবাবুর শ্বশুর মাথায় হাত দিয়ে চুল ছিঁড়ছেন। ও ঘরে আর কেউকে দেখা যায় না। বরুণদাই সুরু করে: আজ সন্ধ্যে থেকে এই সুন্দর বাড়ি ঘাতকের বাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। সন্ধ্যে থেকে বাড়িটার প্রাণ উড়ে গেছে। অরুণ এত কিছু বোঝে না। বরুণদা বলে: আমার মুখেই এই চরম দুঃসংবাদ শুনবেন? কিন্তু এ কথা বলবো কি করে? বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন পূর্ণ, দেখতেই পাচ্ছেন কত লোক আনাগোনা করছে অথচ সকলের চোখের সামনে থেকেই বোম ফাটিয়ে···না, না···এ আমি বলতে পারবো না।

মানসিক স্থৈর্য ফিরে নিয়ে অমরনাথকে বলে: এতকাল তুমি সৌম্যদার পেছনে লেগেছিলে। আজ বুঝতে পারছ তোমাদের কি সর্বনাশ হলো। সম্মান নিয়ে এ বাড়িতে আর থাকতে পারবে? তারপর দুঃখ-দারিদ্র্যে যখন জর্জরিত হবে তখন বুঝবে সৌম্যদা

তোমাদের কি মঙ্গল, কি উপকার করতে এসেছিল। তার বিপক্ষে সংগ্রাম করাই নাকি ছিল তোমার জীবনের মূল ব্রত। আজ সেই উদ্দেশ্য ঈশ্বর নিজেই সফল করেছেন। এবার দারিদ্র্যের অভিনয় দেখবো সারাটা জীবন ভরে। সৌম্যদার আর কি হবে? সম্মান নিয়ে বহু আগেই তোমরা ছেলে-খেলা করেছ। তার ওপরে আর একটা হাস্যকর উপহাসের কলঙ্করেখা অঙ্কিত হল। এই তো? কলঙ্কের যা বোঝা সঞ্চিত হয়েছে তার ওপরে এটা এমন কিছু নয়।

মনের ক্ষোভ আর যাতনা এভাবে এই অকালপক্ক, এঁচড়ে পাকা অর্বাচীন বালকটাকে নাই বা জানালাম। এ ঘটনা যে ঘটবে এতো বহুদিন আগে প্রলয়ের মুখেই শুনেছি। লোকজন নিয়ে হামলা করে বন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নতুন কিছু নয়। তবে পুলিশের সামনে? এটা বিস্ময় লাগে। কিন্তু আমাদের দেশের পুলিশ তো? অনেকে ভাল করে বন্দুক পর্যন্ত ধরতে জানে না। তাদের সে ধরনের শিক্ষাও দেওয়া হয় না। যা অল্প মাইনে তাতে দু'পাইস যদি বাঁ-হাতে নিয়ে কারো উদ্দেশ্যে সাধন করে দেয় তাকে ক্ষতি কিসের? বরুণদাকে বললাম: আমাদের বাড়ির কথা চিন্তা করে একবার দেখুন তো? আপনারা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে কি করবেন বলুন। আর থানা-পুলিশ নিয়ে অযথা মাতামাতি করবেন না। কাকীমাকে বুঝিয়ে বলুন।

এতখানি ঠাণ্ডামাথায় নিজেকে সামাল দিয়ে সংযমের পরিচয় দেবো এ ছিল আমার কল্পনার বাইরের সামগ্রী। কিন্তু নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে এক পক্ষকে বোঝানো গেল, সৌম্যদা আর মাসীমাকে কি বলবো? একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে জানি, কিন্তু এত খরচ করে, নিমন্ত্রিত মানুষদের কি বলে বোঝানো যাবে?

একা অত্যন্ত ঠাণ্ডামাথায় ভাবতে ভাবতে অনেক কিছু স্থির করলাম। সৌম্যদাকে ব্যাপারটাকে না হয় খুলে বলা যাবে, কিন্তু মাসীমাকে? বাড়ি আসার আগেই ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে ঢুকেই মাসীর রণরঙ্গিনী মূর্তি: কালই অন্য মেয়ের

সঙ্গে সমুর বিয়ে দেবো, সেই পার্ট ওয়ান পাশ করা যে মেয়েটার সঙ্গে প্রথম সম্বন্ধ হয়েছিল তাদের বাড়িতে আজই লোক পাঠাচ্ছি। বিয়ে আমি কাল দেবোই। মাকে যদি সত্যকারের কোনোদিন সম্মান দিয়ে থাক তাহলে কাল আমি যে পাত্রীর সঙ্গে বিয়ের স্থির করবো তুমি সুবোধ বালকের মতো তাই করবে। অন্যথা আমার সঙ্গে আর কোনো প্রকারের সম্পর্ক থাকবে না।

তখন আর কিছু বললাম না। ভোরবেলা উঠে মাকে নানান ভাবে বোঝালাম। সম্মানের কথা, প্রতিষ্ঠার কথা, তাছাড়া সত্য কথাটা যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে তখন অন্য মেয়ে বিয়ে করলে এ কলঙ্কের হাত হতে নিজেকে বাঁচানো যাবে না। একজনের সঙ্গে বিয়ের প্রাথমিক কাজ শেষ করে অন্য মেয়ের কাছ থেকে আমি মনের শান্তি পেতে পারি কি করে? ওর চেয়ে অরুণের হাতে ঘরের চাবি দেবো অথবা নবকে প্রেসটা দিয়ে ভোরের ট্রেনে চলে যাই। অযথা দেরি করে লাভ নেই। সকালে অনেকে আসবে। নানান মন্তব্য করবে। তুমি চিন্তা করে দেখো। আমি রাতে অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্তে এসেছি। আর তুমি যদি না যেতে চাও আমি একাই চলে যাবো। আমি এ জায়গায় আর সম্মানহীনের মতো থাকতে পারবো না।

মা বলেন: এখন বুঝতে পারছ মুক্তিবাবু তোমাকে বাড়ি থেকে জোর করে নিয়ে গিয়ে তোমার আর আমাদের কি ক্ষতি করেছে। তুমি কিছুই বোঝ না, বোকা ছেলেই রয়ে গেলে। অযথা নিজের স্বার্থের জন্যে তোমার একটা মূল্যবান জীবন উনি নষ্ট করে দিলেন। যাক্ যা হবার তা হল। এখন, আমার মনে হয় চলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু বাড়ি, প্রেস?

—সম্পত্তির এত মায়া করলে সম্মান বাঁচবে না, মা। নবকে চিঠি লিখে আমি সব গোছ করে নিয়েছি। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে যেতে হবে। অরুণকে বলেছি, ও নবকে এই চিঠিটা দেবে এবং ওকে টাকার গোছাটা দিয়ে বলবে—আজকের সব কিছু ব্যবস্থা করবে এবং একটা আবেদন পত্র সকালে ছেপে প্রচার করবে:

বিভাবরী প্রেস এই অঞ্চলে বহুদিন আপনাদের সেবা করেছে। এই প্রেস এবং এর সংলগ্ন বসৎবাটীর স্বত্বাধিকারী সৌমেন্দু রায় আমার হাতে তুলে দিয়ে গত রাত্রে মাকে নিয়ে বিদেশ যাত্রা করেছেন। আকস্মিক অঘটনের জন্যে ওনার বিয়ে এখানে করা সম্ভব হয় নি। সেজন্যে নিমন্ত্রিত অভ্যাগত অতিথিদের কাছে সৌমেন্দুবাবুর তরফ থেকে আমি ক্ষমা চাইছি। তবে ভোজনের আয়োজন যথারীতি আছে। সহরের নিমন্ত্রিত সমস্ত শুভার্থী কাল রাত্রে যোগ দিলে আমার বহুদিনের আশা চরিতার্থ হবে।

—ঠিক আছে, চল, চলে যাই ॥

[৯]

ইতিহাসে মানুষের মনের কথা লেখা হয় না। জেবউন্নিসা, মুমতাজের মনের কথা কোথাও নেই। ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে তারা চাপা পড়ে গেছে। সেই সব ঘটনায়-ঘেরা দরজার পর্দা সন্তর্পণে সরালে দেখা যাবে মুবারকের সঙ্গে জেবউন্নিসা নিশিযাপন করছে। ইতিহাস মনের খবর রাখে না,—রাখে ঘটনার। কিন্তু আমার মনের কথা আর ঘটনার প্রবাহ কোথাও মুদ্রিত হবে না—না সাহিত্যে, না ইতিহাসে। ছাত্রজীবনে আমার অনুরোধে যে ইতিহাস পড়ল, যাকে ইতিহাস যত্ন করে পড়িয়ে পাশ করালাম—সে যে ইতিহাস সৃষ্টি করলো, তার খবর কেউ রাখবে না। কেউ জানবেও না। গুটি কয়েক মনে তা সাময়িক রেখাপাত হয়ত করতে পারে! শুধু দুটো মন নিজেদের ফেলে আসা ঘটনার মাঝে হারিয়ে গেল। ইতিহাস রচনা করতে পারলো না। সাহিত্য হবে কিনা জানি না। তবে ইতিহাসের শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। History repeats itself. বন্যা তার বিয়ের আগের দিন যে ঘটনার জাল বিস্তার করে অদ্ভুত কাহিনীর প্রবর্তনা করেছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটে গেছে গত বছর ঠিক এমন দিনে। এই সমুদ্রের ধারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে ওখানে, মনে হয় ঐ বোধ হয় বন্যা

বসে আছে···না (দীর্ঘ নিশ্বাস)···সে নয়···সে নয়·· ওরা ভবিষ্যৎ সুখের সন্ধানী দুটি প্রাণী। হঁ্যা, ইতিহাস সে শিক্ষাই আমায় দিল। আমি ইতিহাস ভালবাসতাম। ভালবাসার জ্বালা আমাকে ভোগ করতে হল. শুনি বই মানুষকে দুঃখ দেয় না, কিন্তু আজতো আমাকে দিয়েছে···দিয়েছে আরো অনেককে।

স্বর্গদ্বারের ধারে বসে কত কথা ভেবেছি, জানি না। সমুদ্রের জল বিক্ষুব্ধ হয়ে রেগে উঠতে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। একটু দূরে সরে বসলাম, সেই আমাদের ছবি দেখলাম, আমার কোলে মাথা রেখে বন্যা যেন গল্প করছে। অন্ধকার নির্জন সৈকতে ওদের সেই ছবি দেখছি, আর আমার ফেলে আসা স্মৃতি রোমন্থন করছি। তরুণ মন সবই এক। ইতিহাস এখানে বৈচিত্র্য বেশি আনতে পারেনি। আজকের এদের ছবি আর বছর খানেক আগের আমাদের ছবি— জীবনের অ্যালবামে এদের পাশাপাশি রাখলে বেশি পার্থক্য হবে না। তবু ভাবি,···এদের ভাগ্যরেখা কি আমার মতো ? জানি না। ইতিহাস, তুমি কি নিষ্ঠুর, কি পাষাণ! কার ভাগ্যে কি রেখেছ, এখনও বলে দাও; ওদের বাধা দিই। আর তরুণ মন নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলো না। ওতে হয়ত তুমি শান্তি পাও, আমরা দুঃখে আর্তনাদ করে উঠি। আমার যা করেছ তাতে তোমার দুঃখ হয় না ?

দেখলাম, মেয়েটা ছেলেটার মুখের ওপর মুখ রেখে আবেগে কি সব বলতে লাগলো। আমি কিছুটা আনমনে খেয়াল বসে আওড়াই :

"আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে।
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা, মুছে যাওয়া তোমার সিঁন্দুরে।"

"In such a night—
Did young Lorenzo swear he loved her well,
Stealing her soul with many vows of faith
And ne'er a true one."

এই গভীর নিশীথে হঠাৎ সেক্সপীয়র আবৃত্তি করে কে ? ছেলেটা মৃদু স্বরে বলে : জেসিকা, আজ তুমি আমার হাত ধরে চলে এসেছ আমি এরপর আর কথার নড়চড় করবো না। কিন্তু আমাদের মনের কথা ঘোষক কি করে জানবে ? দূরে কে ? পরিচিত মনে হচ্ছে। আপনি সেক্সপীয়র পড়ছিলেন ? এত রাতে ?

—না, এই রাতটা আমি পুরীতে কাটাই। সেই একটা দিনের স্মৃতি আজও ভুলতে পারিনি। ভুলবোই বা কি করে ? যখন মনে পড়বে ?

"আজি জাগিয়া উঠিয়া পরাণ আমার বসিয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধন সুখে হৃদয় নাচে ;
ত্রাসে উল্লাসে পরাণ আমার ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে ॥"

পাশে দণ্ডায়মান ভদ্রলোক আবেগে আবৃত্তি করেন :

"প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ,
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে ভাবে বিভোল।
দে দোল্ দোল্।
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ দুটো পাগল,
দে দোল্ দোল্।"

—আপনি আজও একা ?

—একা থাকার স্বপ্ন ছোট থেকেই দেখতাম, এক ভদ্রলোক নিজের মুক্তির জন্যে—নাম অবশ্য তার ছিল মুক্তিবাবু—যত কাজ করলেন। নিজে মুক্তি পেলেন স্বর্গে গিয়ে। আমার মুক্তি হল না। এজন্যে বছরের এই দিনে স্বর্গদ্বারে এসে স্বর্গে যাওয়ার সিঁড়ি খুঁজে বেড়াই, যদি পাই তো উঠে যাবো, পেলাম না। পেলাম আপনাদের। আবার সেই বন্ধন—সহস্র বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ !

*　　　*　　　*

—সোমেনদা, কখন এলেন ? প্লিজ একটু গান করুন। তোমার গান বহুদিন শুনিনি। আমার স্ত্রীতো গান শোনার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। তোমার সেই পুরোনো গলা! আহা!

—নারে। আজ দোল বলে···পুরীতে রথের মেলাই ভাল। বাংলার দোল যাত্রা ভোলা যায় না। তাই ফিরে এলাম। সকালেই এসেছি। কাজের জন্যে আসতে পারিনি। নব'র কাণ্ডকারখানা জানিস্? দেখি পড়ার ঘরটা এক ফুট ধুলোয় ভর্তি। আর হার-মোনিয়ামটা ? চেনার উপায় নেই, তাছাড়া আসতাম না রে, গত রাতে পুরীর সমুদ্র তীরে বেড়াতে বেড়াতে ··অসিত আলোটা জ্বেলে দাও, জীবনে আর অন্ধকার এনো না। এখন আলোর, মুক্ত হাওয়ার রাজত্বে বাস করতে চাই।

—সোমেনদা তুমি বড্ড বেশি দার্শনিক হয়ে গেছ, ঠিক বিয়ের আগের দিনগুলো···নিন হারমনিয়ামটা ধরুন। টেবিলে রাখা 'পূরবী' কাব্য চোখে পড়ে।

—অসিত 'আহ্বান' কবিতাটা পড়েছ : আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার / যে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে···

হঠাৎ দ্বারে টোকা পড়ে।, কে ডাকে ?

—অসিত, বলো গানটা সেরে যাবো। একটু অপেক্ষা করুক। আচ্ছা অসিত, তোমাদের এই তেজী আমগাছটা কেমন যেন বুড়ো হয়ে গেছে। এই একটা বছরের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশি শুকিয়ে গেছে। আবার দেখো সেই শুকনো ডালের নীচে একটা কচি ডালে কয়েকটা কচি মিষ্টি পাতা বেরিয়েছে। দেখো, চড়াই-গুলো পাতার মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে। আজ কোকিলের ডাকও শুনলাম। কি ব্যাপার বুঝছি না।

অসিতের নব বিবাহিতা স্ত্রী এসে জানায় : সোমেনদা, আপনার জন্যে এক ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন।

মলিন শতছিদ্র কাপড়। চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। বিবর্ণ পাংশু মুখ। কোলে একটা কালো কঙ্কালসার দেহ। আমাকে

দেখতে পেয়ে চোখ দুটো আনন্দে জ্বলে উঠল। টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ দেখার পর চিনতে পারলাম। ততক্ষণে অসিতের নবপরিণীতা এসে হাজির।

—তুমি এখানে ?...

—বিশেষ প্রয়োজন সৌমেন্দুদা। অনেক কথা বলার আছে। আজ সন্ধ্যায় একবার যদি আমাদের বাড়িতে আসেন তো ভাল হয়।

—কোথায় আছ তোমরা ?

—আমরা ? আমার ছেলে আর আমি মোড়ের সেই ভাঙা বস্তি বাড়ির একটা চালায় থাকি। আজ যদি আসেন খু-বি ভাল হয়। বিশেষ প্রয়োজন।— চোখে তার অনুনয়ের করুণ আকৃতি।

ততক্ষণে অনেকে এসে হাজির হয়েছে। সৌমেন্দু পরিচয় দেয় না। রাত সাতটা—

গান আর হল না। হাসি-তামাসাও বন্ধ হল। বাড়ি ফেরে। নবকে জানায়। নানান বিরূপ মন্তব্য শোনা যায়। তবু পুরোনো বন্ধুর আবেদনে কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যে সৌমেন্দু যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

অন্ধকার নির্জন পথ। সাতটা বোধ হয় বেজে গেছে তখন। আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে সৌমেন্দু যায়। গলির পথ। ইট-পাথরে ভর্তি। তাই হোঁচট খেতে হল অনেক। হ্যারিকেন নিয়ে কে যেন দ্বারে দাঁড়িয়েছিল। রকের একটা চালা-বাড়ানো ঘর। আমার বসার জন্যে একটা ভাঙা চেয়ার। হ্যারিকেনটা দেওয়ালের একটা খোঁচায় বাঁধা। পাশে নোংরা দুর্গন্ধ। নর্দমা পচে ভট্ ভট্ করছে। তারি মাঝে কোনো রকমে কষ্ট করে ভাঙা চেয়ারে বসলাম। বন্যা একটু পরে এলো। গলায় কাপড় দিয়ে আবির এনে পায়ে প্রণাম করে বলে: সৌম্যদা, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার মতো একটা উজ্জ্বল প্রতিভাকে আমি নষ্ট করে দিয়েছি। আপনি অনেক বড় হতে পারতেন। পারেন নি শুধু আমার জন্যেই। আজ দোলের দিনে আপনার কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাই। কত দিন আপনার

মান-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি। আমি যে অপরাধ করেছি তার চরম শাস্তি আমি এই একটা বছরে পেয়েছি। মর্ত্যের ধূলিতেই সে নরক যন্ত্রণা আমি ভোগ করে নিয়েছি। তখন কি মোহের ঘোরে ঘুরেছি জানি না। নিজের এতখানি ক্ষতি করেছি এ আমি কোনোদিন ভাবিনি। আজ সব অঙ্কের যবনিকাপাত হয়েছে। নায়ক প্রবঞ্চিত করে দূরে সরে গেছে। এই ভাঙা এঁদোপড়া বস্তিতে আমাকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে যমরাজ ঠেলে দিচ্ছে। আমি কি প্রাচুর্যে ছিলাম সৌম্যদা! আর আজ কি নরক ভোগ করছি। এর কি জ্বালা, কি ব্যথা, কি দুঃখ, কি বেদনা তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমার দুঃখের কথা শুনলে পাষাণও গলে জল হয়ে যায়। আপনার যে ক্ষতি করলাম তার জন্যেই এত অনুতাপ। একটা নিরীহ মানুষের ক্ষতি করার অপরাধে ভগবান মাত্র একটা বছরে এতখানি শাস্তি দিবেন এ আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন সৌম্যদা, ক্ষমা করুন—বন্যার চোখের জল আমার পায়ে পড়ে।

আমি পাথরের মতো ভাঙা চেয়ারে বসে, আমার পায়ের ওপরে মাথা রেখে বন্যা তখনও বলছে: একটা বিশেষ অনুরোধ রাখলে খুব খুশি হবো সৌম্যদা। আমার এতো দুঃখ দারিদ্র্য সত্ত্বেও আজকের এই পবিত্র দিনে আমাদের ছাদের ওপরে বসে আপনার সঙ্গে যে আংটি বিনিময় করেছিলুম সে আংটি আজও স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছি। সে আংটি দিয়েই প্রথম আমার হৃদয়ের ভালবাসার অর্ঘ্য অর্পণ করেছিলুম; আজ সে স্মৃতির পবিত্র স্বাক্ষর আপনার হাতে আবার তুলে দিতে চাই। জানি, সে দিন আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। জানি, সে মন আপনার আর নেই। জানি, সে হৃদয় দিয়ে আর কোনোদিন আমাকে ভালবাসতে পারবেন না। তবু আজও মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, আপনি যে পবিত্র বন্ধুত্বের বন্ধন রচনা করতে সেদিন গিয়েছিলেন মূলত আমার মূঢ়তায় সে স্বপ্নসৌধ রচিত হয় নি। আজ সেই চিড়িয়াখানার স্মৃতি মনে পড়ে। বেদুইন পাখিরা যখন মনের

তোরণদ্বার খুলে বহুদূরে উড়ে যাচ্ছিল আপনি শুধু বলেছিলেন : এইভাবে আমি উড়ে যাবো—হেথা নয়, হেথা নয় ; অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে। পাশের শিশুটা হঠাৎ কেঁদে উঠল। এর জন্যই আমার যত ভাবনা সৌম্যদা, নইলে আত্মহত্যা করতাম। কিন্তু পারি না—ছেলেটার দিকে কান্নাভেজা চোখে তাকায়।

সৌমেন্দু উদাসভাবে চেয়ে : আত্মহত্যা করবে কেন ? কোন্‌ অপরাধে ? যাকে পৃথিবীতে এনেছ তাকে মানুষ করার দায়িত্ব তোমার আছে। তোমার শিক্ষা আছে ; তুমি ভদ্রবাড়ির মেয়ে। তোমার মুখে এই ধরনের কথা শোভা পায় ?

বন্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে : কি করবো সৌম্যদা, উপায় নেই। দারিদ্র্যের জ্বালায় আমাকে পথে নামতে হয়েছে। আমি আজ ভ্রষ্টা, পতিতা। সমাজে আমার স্থান নেই, নানান অসৎ প্রবৃত্তির আশ্রয় আমাকে নিতে হয়েছে। আমি আর পারি না সৌম্যদা। আমি আ···র পারি না। আজ আমাকে কত লোকের মনোরঞ্জন করতে হচ্ছে তা জানেন ? আমি কত লোকের দেহবিলাসের সামগ্রী হয়েছি তা জানলে ঘৃণায় আপনার গা রি রি করে উঠবে, আমি আর পারছি না, পারি না, আমাকে রক্ষা করুন—সৌমেন্দুর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বন্যা।

সৌমেন্দু নিজেকে সংযত করে বলে : তোমার মা, ভাই তোমাকে দেখে না ? তারা কোথায় ? প্রলয়ের ঘনিষ্ঠ সহচর নেপালদা কোথায় ?

—আমার কেউ নেই···কেউ নেই। আমাকে আজীবন ধাপ্পা দিয়ে যে ছেলেটা আমার এত বড় সর্বনাশ করল সেও চলে গেছে। জানতাম তার অন্য বান্ধবী আছে, তা সত্ত্বেও কি করলাম···আমি এ কি করলাম। আপনার ভাগ্য গণনা এতখানি অভ্রান্ত এ আমি জানতাম না। আপনাকে পেয়ে আজ সব ভুলে গেছি। এতদিনের দুঃখ অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়ে তা পুড়ে আজ ছাই হয়ে গেল। আপনি শুধু ক্ষমা করুন আর আমাকে আশীর্বাদ করুন

হঠাৎ চাঁচের দরজা খুলে একটা বিকৃত গন্ধের মানুষ এসে : হ্যাঁরে একে আবার কবে জোটালি ? তোর দেখি নাগরের অভাব নেই। অনেক অনেক নাগর ! লোকটা মুখটাকে বিকৃত করে— বলি কেন, একি আমার চেয়েও বেশি টাকা দেয় ? তবে এর সঙ্গে এত পীরিত কিসের ? যাও বাবা। যাও ভেগে পড়ো। এক হপ্তা কনট্রাক্ট করা। এ হপ্তায় এ সময়ে সুবিধা হবে না, আগাম টাকা দেওয়া আছে।

মদের গন্ধে ঘরটা ভরে গেল, বাচ্চা ছেলেটা প্রাণ ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। রক্তমাখা চোখ আর বিশ্রি গন্ধ থেকে কখন চলে এসেছি, জানি না। ঘরে বসে ভাবছি একটা উজ্জ্বল প্রতিভার কথা। বাপ-মার অসাবধানতার জন্যে সমাজের বিরাট ক্ষতির কথা, আর্থিক সহযোগিতার কথা। আমার ভাগ্য গণনার মূল্য কেউ দেয় নি। একমাত্র বন্যাই পয়সা, চাল আর সুপারি দিয়ে নিজের ভাগ্যকে অভ্রান্ত করেছিল। গণনায় কারো কথা ঠিক হয় নি। কিন্তু যার হলো তার এতখানি ক্ষতি হবে এ আমি ভাবতে পারি নি। হঠাৎ এক বালক ঝড়ো হাওয়ায় টেবিলের ওপরে রাখা ডাইরীটার ক'টা পাতা উড়ে গেল। চোখে পড়ল পুরীতে বসে প্রথম বিনিদ্র রজনীতে লেখা সেই ছোট গল্পটার স্মৃতি ; হাতে ধরে বন্যার সেই কান্না : এ তুমি কেন লিখলে সৌম্যদা ? কেন ? কেন ?

কল্পনা বাস্তবে এতখানি রূপান্তরিত হয় তা জানতাম না। ··· অনুতাপের অনলে, একটা বছর দগ্ধ হয়েছি, তবু মুখ ফুটে তার প্রতিবাদ করতে পারি নি সৌম্যদা। ছেলেরা এমন ভাবে অভিনয় করতে পারে···এ আমি জানতাম না।

···আমার জন্যে দুঃখ করার কেউ নেই সৌম্যদা, কেউ নেই। আপনার গল্পের সুপর্ণা রায়ের সুজয়ের মতো আমার প্রলয়ও আমাকে বিদায় দিয়েছে। আমি আজ ভ্রষ্টা হতে চলেছি।··· আপনার জ্যোতিষের কথা অভ্রান্ত, আমার মুক্তির আর কোনো পথ নেই সৌম্যদা ?

নিজের অজান্তে কখন চোখের জল পড়ে লাইনগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে জানি না শুধু জানি তার ভাগ্য আজও অপরিবর্তিত আছে।

হয়ত কোনোদিন নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনা করতে গিয়ে গৃহদাহের সুরেশের মতো প্রলয়ের অবচেতন মন বলে উঠবে : অচলার মতো এমন সুন্দর জিনিসটি মাটি করে দিলুম। না পেলুম নিজে, না পেতে দিলুম অপরকে।

——:•:——